১৯৫৩ সালের

পাঞ্জাবের গোলযোগ

সম্পর্কিত

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের

সংক্ষিপ্তসার

ডিপার্টমেন্ট অব এডভারটাইজিং, ফিল্মস্ এণ্ড পাবলিকেশান্স্

গভর্ণমেণ্ট অব পাকিস্তান

করাচী

শিকদার তাহের আহমদ

১৯৫৩ সালের

পাঞ্জাবের গোলযোগ

সম্পর্কিত

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের

সংক্ষিপ্তসার

Md. Hamidullah Sikder
Narayanganj.

ডিপার্টমেণ্ট অব এডভারটাইজিং, ফিল্মস্ এণ্ড পাবলিকেশান্স্
গভর্ণমেণ্ট অব পাকিস্তান
করাচী

মিজবাহ তাহের আহমদ

সূচী

বিষয়				পৃষ্ঠা
১। প্রথম অধ্যায়				
বিরোধের গোড়া	....	....	....	১
২। দ্বিতীয় অধ্যায়				
আলেমদের কার্যকলাপ ও প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা	....	....	....	১৭
৩। তৃতীয় অধ্যায়				
সামরিক আইন জারির কারণ	....	....	....	২৩
৪। চতুর্থ অধ্যায়				
মুসলমান ও আহমদীদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ		....	....	২৬
৫। পঞ্চম অধ্যায়				
হাঙ্গামার দায়িত্ব	....	....	....	৫৮

প্রথম অধ্যায়

দেশ বিভাগ থেকে লাহোর কনভেশন পর্যন্ত

●

বিরোধের গোড়া

সরকারী নথি-পত্রে বর্ণিত 'আহ্‌রার-আহ্‌মদীয়া মত-বিরোধে'র মধ্যেই গোলযোগের সূচনা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ মত-বিরোধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই চলে আস্‌ছে।

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন মির্জা গোলাম আহ্‌মদ। ইনি শিখ-দরবারের একজন সিপাহ্‌সালার মির্জা গোলাম মুর্তজার পৌত্র। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে ইংরেজী ১৮৩৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মির্জা গোলাম আহ্‌মদ জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটির সত্বাধিকার ছিল তাঁরই বংশের হাতে। তিনি বাড়ীতে ফার্সী এবং আরবী ভাষা শেখেন; তবে কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয় না। ১৮৬৪ সালে তিনি শিয়ালকোটের জেলা আদালতে একটি চাকুরী পান এবং চার বছর যাবৎ সেখানে কাজ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ধর্মীয় সাহিত্য অধ্যয়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৮০ থেকে পরবর্তী চার বছরের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বুরাহীন-ই-আহ্‌মদিয়া' (৪ খণ্ড) লেখেন। পরে তিনি আরো কতকগুলি বই লেখেন। এই সময় খুব তীব্র ধর্মীয় মতবিরোধ চল্‌ছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণ করা হচ্ছিল। এ আক্রমণ শুধু খৃষ্টান পাদ্রীদের তরফ থেকে আসেনি—আর্য-সমাজের প্রচারকরাও কিছু কম ছিল না। উদারপন্থী হিন্দু আন্দোলন হিসেবে আর্য-সমাজ তখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ছিল।

১৮৮২ সালের মার্চ মাসে মির্জা গোলাম আহমদ দাবী ক'রে বসেন যে, তাঁর কাছে এই মর্মে এক দৈব-বাণী (ইল্‌হাম) নাজেল হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে এক বিশেষ ও মহান উদ্দেশ্য সাধনের ভার দিয়েছেন। অন্য কথায়, তিনি হচ্ছেন একজন 'মা'মুর-মিন্‌-আল্লাহ্‌'। ১৮৮৮ সালে অন্য একটি দৈব-বাণীর বলে তিনি তাঁর সমর্থকদের কাছ থেকে আনুগত্য বা 'বাইয়াত'-এর দাবী করেন। ১৮৯০ সালের শেষের দিকে মির্জা সাহেব এই মর্মে আরেকটি ইল্‌হাম পান যে, ইসা (আঃ) ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মারা

যাননি বা ক্রুশ থেকে তাঁকে বেহেশ্‌তে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়নি; তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বিক্ষত অবস্থায় ক্রুশ থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং আরোগ্য ক'রে তোলে। এর পরে তিনি কাশ্মীরে পালিয়ে আসেন এবং স্বাভাবিকভাবে ইন্‌তিকাল করেন। কেয়ামতের প্রাক্কালে তিনি তাঁর পার্থিব দেহ নিয়ে আবার আবির্ভূত হবেন ব'লে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, সেটা মিথ্যা; তিনি আবার আবির্ভূত হবেন—এ-কথার অর্থ এই যে, ইসলামের নবীর উম্মতের মাঝেই ইসা (আঃ)-র গুণাবলী নিয়ে অন্য একটি লোকের আবির্ভাব হবে এবং সে লোকটি হচ্ছেন মির্জা সাহেব নিজেই। মির্জা সাহেব 'মসীল-ই-ইসা' এবং অঙ্গীকৃত ত্রাণ-কর্তা।

এই মতবাদ প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটা বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ, ইসা (আঃ) সশরীরে বেহেশ্‌ত থেকে নামবেন ব'লে যে সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত, এটা তার বিরুদ্ধে। মুসলিম ধর্মবিদ্‌গণ এর বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষেপে উঠেন। এর কিছু পরে, মির্জা সাহেব নিজেকে অঙ্গীকৃত মাহ্‌দি ব'লেও দাবী করেন; তবে দেশ-জয়কারী ও রক্তক্ষয়কারী মাহ্‌দি নন্—যুক্তি-বিচার দ্বারা নিজের বিপক্ষকে পরাভূত করার শক্তি সম্পন্ন মাহ্‌দি। এই নতুন দাবীর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা আরো জোরালো হয়ে ওঠে এবং আলেমগণ তাঁকে কাফের ব'লে ফতোয়া দিতে শুরু করেন।

১৯০০ সালে তিনি আরো একটি মতবাদের সৃষ্টি করেন। তিনি বলেন, এরপরে অস্ত্রের জিহাদ ব'লে কিছু থাকবে না, যুক্তি দ্বারা বিপক্ষকে বুঝানই হবে জিহাদের গণ্ডী। ১৯০১ সালে মির্জা সাহেব নিজেকে নবী ব'লে দাবী করেন এবং একটি বিজ্ঞাপনের মারফৎ 'খত্‌ম-ই-নবুয়াত' বা নবী-প্রেরণের-অবসান সম্পর্কীয় মতবাদের এই ব্যাখ্যা করেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মৃত্যুর পর নতুন শরীয়াত নিয়ে কোনো নবী আসবেন না, তবে শরীয়াত ব্যতিরেকে কোনো নতুন নবীর আবির্ভাব এই মতবাদের বিরোধী নয়। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে শিয়ালকোটে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে তিনি নিজেকে 'মসীল-ই-কৃষ্ণ' বলেও দাবী করেন।

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০১ সালে এবং ঐ বছরের আদম-শুমারীতে মির্জা সাহেবের নিজের অনুরোধে এই জামাতকে মুসলমানদের একটি আলাদা ভাগ হিসেবে দেখানো হয়। পাকিস্তানে এই দলভুক্ত লোকদের বর্তমান সংখ্যা দু'লক্ষের কাছাকাছি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশে এবং ভারতে, ইউরোপে ও আমেরিকায়ও আহ্‌মদিয়া দলভুক্ত লোক আছে।

মির্জা সাহেব বেঁচে' থাকতেই তাঁর এই নতুন আন্দোলনের বেশ কিছু সমর্থক জোটে। এদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ও প্রভাবশালী লোকও ছিলেন। ১৯০৮ সালে মির্জা সাহেবের মৃত্যু হলে মৌলবী নূরুদ্দিন আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে মৌলবী নূরুদ্দিন মারা যান। তাঁর স্থলে মির্জা গোলাম আহ্‌মদের পুত্র ও আহ্‌মদীয়া দলের বর্তমান প্রধান মির্জা বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ দ্বিতীয় খলিফা হন। তাঁর খলিফা হওয়াতে জামাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ফলে খাজা কামালউদ্দিন এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে এক অংশ জামাত থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি ভিন্ন দল গঠন করেন। এঁদেরকে বলা হয় লাহোর দল। দু'দলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাদিয়ানী দল মির্জা গোলাম আহ্‌মদকে নবী ব'লে বিশ্বাস করেন; কিন্তু লাহোর দল তা করেন না। তাঁরা বলেন, মির্জা গোলাম আহ্‌মদ মোজাদ্দিদ বা মুহাদ্দাসের বেশী কিছু নন। লাহোর দল 'আহ্‌মদিয়া আন্‌জুমান-ই-ইশাত-ই-ইসলাম' নাম দিয়ে লাহোরে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উভয় দলই বিদেশে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচারের কাজে নিযুক্ত।

আহ্‌রার

আহ্‌রারগণ হচ্ছেন কংগ্রেস থেকে বিক্ষিপ্ত একদল জাতীয়তাবাদী মুসলমান। এঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৩১ সালের ৪ঠা মে লাহোরে এক সভায় 'মজলিস-ই-আহ্‌রার-ই-ইসলাম' নামক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। ১৯৩১ সালের কাশ্মীর আন্দোলনের সময়ই এঁরা প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। এই বছরের ৩০শে অক্টোবর তারিখে মজহার আলি আজহার একশ' জন আহ্‌রার স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল নিয়ে শিয়ালকোট থেকে জম্মু এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করেন। কাশ্মীরী মুসলমানদের প্রতি ডোগরা দরবার যে নির্মম অত্যাচার করছিল, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে পাঞ্জাবে কাশ্মীর আন্দোলন গড়ে ওঠে। কাশ্মীরী মুসলমানদের অভিযোগের মধ্যে ছিলঃ ষ্টেট কর্তৃক কতকগুলি মসজিদ, কবরস্থান এবং মুসলমানদের অন্যান্য পবিত্র-স্থান দখল করে নেওয়া; সরকারী দফ্‌তর থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করা, ধর্মীয় কাজে বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং রাজ্যে জন-সংখ্যার অনুপাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার মতো কোনো সুসংগত আইন-সভা না থাকা। এই-সব অভিযোগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে আন্দোলন চালানোর ফলে ১৯৩১ সালের ১৩ই জুলাই শ্রীনগরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার ফলে উদ্ভূত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যে 'মজলিস্-ই-আহ্‌রার' এবং 'নিখিল ভারত কাশ্মীর কমিটী' নামক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান উভয়েই চেষ্টা করে। এই কাশ্মীর কমিটী গঠিত হয় ২৬শে জুলাই এবং এতে ডাঃ স্যার মোহাম্মদ ইকবাল, নবাব স্যার জুলফিকার আলি খান, খাজা হাসান নিজামী, নবাব ইব্‌রাহীম আলী খান এবং আহ্‌মদিয়া জামাতের বর্তমান প্রধান মির্জা বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ প্রভৃতি লোকেরা ছিলেন। কমিটীর সেক্রেটারী ছিলেন একজন আহ্‌মদী; তাঁর নাম ছিল আবদুর রহীম দার্দ। কাশ্মীর আন্দোলন কালে আহ্‌রার এবং আহ্‌মদীরা ভিন্ন দলে থাকায় যে পারস্পরিক শত্রুতা গড়ে ওঠে, সেটাই প্রধানতঃ এদের মধ্যকার পরবর্তী সংঘর্ষের কারণ। আহ্‌রার দল ১৪ই আগষ্ট 'কাশ্মীর দিবস' পালন করে এবং পরের দিনই ঘোষণা করে যে, তা'দের কাশ্মীরী মুসলমান ভাইদের তরফ থেকে তারা আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেছে। এর আগেই বলা হয়েছে, ৩০শে অক্টোবর তারিখে মজহার আলি আজহার একশ' জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে জম্মু এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করেন। এই নাটকীয় ঘটনার ফলে সংগে সংগেই আহ্‌রারদের খুব খ্যাতি লাভ হয়।

আহ্‌রাররা যদিও কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তবুও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তা'রা কংগ্রেসের সংগে দহরম-মহরম করতে থাকে। ১৯৪০ সালের ৩রা মার্চ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মজলিস-ই-আহ্‌রারের কার্য-নির্বাহক কমিটী যে-সব প্রস্তাব পাশ করে তার একটিতে পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়। এর পরে আহ্‌রার নেতাদের কোনো কোনো বক্তৃতায় পাকিস্তানকে 'পলিদিস্তান' ব'লে গাল দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালের ২৯শে নভেম্বর সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে মওলানা দাউদ গজনভি ঘোষণা করেন যে, আহ্‌রার দল কংগ্রেসের সংগে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। ১৯৪৩ সালের ১৭ই থেকে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত গুজরানওয়ালায় অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব প্রাদেশিক আহ্‌রার সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে এবং এই বছরই সাহারানপুরে গৃহীত পরবর্তী এক প্রস্তাবে তা'রা নিজেদেরকে ভারত-বিভাগের বিরোধী ব'লে ঘোষণা করে। কারণ, তাদের মতে, এতে দেশের গায়ে অস্ত্রোপচার করা হ'বে। আহ্‌রার নেতারা তাদের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় মুসলিম লীগ ও তা'র নেতাদের বিরূপ সমালোচনা করতে থাকে। কায়েদে আজমকেও তারা বাদ দেয়নি। কারণ, যদিও তখনকার দিনে কায়েদে আজমকে সবাই মুসলিম জাতির একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ব'লে স্বীকার করতো, আহ্‌রারদের তাঁর প্রতি কোনো

সিকদার তাহের আহমদ

শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁর উদার মতামত এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বাহ্যাড়ম্বরহীনতার হীন সুযোগ নিয়ে আহ্‌রারগণ তাঁকে ধর্মে অবিশ্বাসী বলে' আখ্যা দেয়। আহ্‌রার দলের অন্যতম নেতা মওলানা মজহার আলি আজহারকে এই ছড়াটির রচয়িতা বলা হয়েছে:

('এক কাফেরা কে ওয়াস্তে ইসলাম কো ছোড়া
ইয়ে কায়েদে-আজম হ্যায় কেহ্ হ্যায় কাফিরে-আজম।)

ইনি তদন্ত কমিশনের সামনে দম্ভ ক'রে বলেন যে, এখনও তিনি ঐ মত পোষণ করেন। আহ্‌রারদের বক্তৃতায় কায়েদে-আজমের পার্শী মহিলা বিবাহেরই কেবল উল্লেখ করা হয় না, তিনি যে মক্কায় হজ্ব করতে যাননি সে-কথাও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে তা'রা শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ আবার জিইয়ে তোলার চেষ্টা করে এবং ১৬ই নভেম্বর মজহার আলি আজহার এবং তাঁর ছেলে মুস্তাফা কাইসার 'মাদাহ্-ই-সাহাবা' আন্দোলন আবার শুরু করার জন্যে লাহোর থেকে লক্ষ্ণৌ রওয়ানা হ'য়ে যান। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিন জন আহরার প্রার্থীকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়; কিন্তু তাঁরা সবাই পরাজিত হন। মুসলিম লীগ এরপরে পাঞ্জাবে যে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করে, তা থেকে আহ্‌রারগণ সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে।

আহ্‌রারদের প্রধান কার্য-কলাপের একটি ছিল কোনো না কোনো প্রকারে আহ্‌মদীদের বিরোধিতা করা। এ-কথাও বলা যেতে পারে যে, আহ্‌মদীদের প্রতি বিদ্বেষের ভেতরই আহ্‌রার দলের জন্ম। মজলিস-ই-আহরার প্রতিষ্ঠার মাত্র দ'বছরের মধ্যেই তারা এক প্রস্তাব পাশ করে যে, কোনো গণ-প্রতিষ্ঠানেই যেন আহ্‌মদীদের নির্বাচিত না করা হয়। ভারত-বিভাগের পূর্বে কাদিয়ান ছিল প্রায় পুরোপুরি আহ্‌মদীদের শহর। ১৯৩৪ সালে আহ্‌রাররা সিদ্ধান্ত করে যে, তারা কাদিয়ানেই এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করবে। কিন্তু এই সম্মেলন নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে তা'রা মাত্র মাইল খানেক দূরে রাজাদা নামক গ্রামে সেই বছরের ২১শে অক্টোবর তাদের সভার ব্যবস্থা করে। বহু সহস্র লোক তাতে যোগদান করে। সেই সম্মেলনে জনপ্রিয় আহ্‌রার বক্তা সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে পাঁচ ঘণ্টা ধরে এক বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের মনে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার মতো কথা ছাড়া এ-বক্তৃতায় আর বিশেষ কিছু ছিল না। এ-বক্তৃতার জন্যে বুখারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং বিচারে তাঁর শাস্তি হয়। বিচার এত উত্তেজনাপূর্ণ হয় যে, পূর্বোক্ত বক্তৃতার চেয়ে এতে বরং বেশী আগ্রহ ও আহ্‌মদী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তখন থেকে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য আহ্‌রার বক্তা আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের নেতা ও তাদের মতামতের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালিয়ে আসছে।

১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আহ্‌রারদের পক্ষে একটা বিশেষ হতাশার কারণ হ'য়ে পড়ে। কেননা, সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হাতে। ফলে ভারতে ও পাকিস্তানে আহ্‌রারদের কার্যকলাপের সুযোগ গেল বন্ধ হ'য়ে। নতুন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের পক্ষে এক দুর্ঘটনা স্বরূপ—এতে তাদের আদর্শ গেল বানচাল হয়ে এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা গেল বিলীন হয়ে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা নিজেদেরকে দেখতে পেল এক নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে—ভবিষৎ যেন একেবারেই অন্ধকার। এদের দু'জন নেতা মৌলবী আবদুল গনি দার এবং মওলানা হাবিবুর রহমান ভারতে থাকারই সিদ্ধান্ত করেন। আরেকজন খ্যাতনামা নেতা শেখ হুসামুদ্দিন কিছুদিন

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

দো-মনা থেকে শেষ পর্যন্ত লাহোরের ভিরা হোটেলের ভার গ্রহণ করার জন্যে পাকিস্তানে আসেন। প্রবোধচন্দ্র নামে এক কংগ্রেসী এই হোটেলের ভার তাঁর হাতে দেন। লুধিয়ানার মাষ্টার তাজুদ্দিন আনসারী এবং জলন্ধরের মৌলবী মুহাম্মদ আলিও পাকিস্তানে আসেন। প্রথম জন শিয়ালকোটে এবং দ্বিতীয় জন মুলতানে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। এমন কি গুজরাটবাসী সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীও বাসস্থান বদল করে' মুজাফ্ফরগড়ের এক গ্রামে চলে আসেন। মওলানা মজহার আলি আজহার রাজনীতি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেন। সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান শিয়ালকোটে তাঁর গ্রাম আলোমোহারে নিভৃত জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে দলের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বিবেচনার জন্য সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর গ্রাম খান্‌গড়ে আহ্‌রার কার্যকরী কমিটীর এক বৈঠক বসে। কিন্তু এতে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকেও বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। এই বৈঠকে তিনটি সম্ভাব্য পথ বিবেচনা করা হয়ঃ যেমন, দল ভেংগে দেওয়া; রাজনীতি ত্যাগ ক'রে কেবলমাত্র ধর্মীয় কার্য-কলাপ গ্রহণ করা এবং দলকে সজীব রাখা। একটি মাত্র সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—সেটি হচ্ছে যে, একটি 'নিখিল পাকিস্তান মজলিস-ই-আহ্‌রার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর পরে ১৯৪৮ সালের মে মাসে লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে আহ্‌মদীদের সম্পর্কে খুব সামান্য উল্লেখ করা হয় এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮-এর জুন মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত এর পরবর্তী বৈঠকে আরো স্পষ্ট ক'রে পাকিস্তানের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করা হয়। এই সংগে এ-ও আভাস দেওয়া হয় যে, আহ্‌রাররা মুসলিম লীগে যোগদান করছে না শুধু চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান ও মিয়া ইফ্‌তিখারউদ্দিনের মতো লোকদের অনৈসলামিক মতবাদের দরুন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেলা-মেশা হয় লাহোরে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসের ১২ই থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত আহ্‌রার দলীয় জোট রক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে। এখানেই এরা ঘোষণা করে যে, আহ্‌রাররা আর রাজনৈতিক দল থাকবে না—তার পরিবর্তে ধর্মীয় জোট হিসাবে কাজ চালিয়ে যাবে। রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলিম লীগের অনুসরণ করবে ব'লেও তা'রা ঘোষণা করে। এর পরে আহ্‌রারগণ তবলিগ সভার নাম দিয়ে তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠান করতে শুরু করে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় তা'রা এ-ধরণের অনেক-গুলি সভার আয়োজন করে। আহ্‌মদীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব'লে ঘোষণা করার দাবী প্রথম করা হয় রাওলপিণ্ডির এক সম্মেলনে।

১৯৪৯ সালের পয়লা মে তারিখে পিণ্ড দাদন খানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এই দাবীর প্রতি আবার জোর দেওয়া হয়। এর পরে আহ্‌মদিয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ও চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের সমালোচনা সমস্ত আহ্‌রার বক্তৃতার নিয়মিত বিষয় হ'য়ে গেল। তখন থেকে তা'রা মনে করলো, মুসলিম লীগের সহায়তার আর কি প্রয়োজন, আলাদা দল হিসেবেই তা'রা ভবিষ্যতে কাজ চালাতে পারবে। মুসলিম লীগও তাদের প্রতি নেক নজরে তাকাতে লাগলো। এ-বছরের ২৭শে ডিসেম্বর করাচীতে পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্য-নির্বাহক কমিটী বদ-নজর মার্কা যে উনিশটি দলের তালিকা তৈরী করে তা থেকে দেখা গেল আহ্‌রাররা বাদ।

আহ্‌রারদের বুঝা উচিত ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের পুরোনো মতবাদ অকেজো হ'য়ে গেছে এবং নতুন রাষ্ট্রে তাদের পুরোনো কার্য-কলাপের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আহ্‌রাররা তেমন পাত্র নয়। তা'রা হচ্ছে ঝানু আন্দোলনকারী। জনপ্রিয়তা লাভের আশায় তা'রা বহু আন্দোলনের

পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নতুন পরিস্থিতিতে কি ক'রে তাদের কার্য-কলাপের একটা রাস্তা বের করা যায়, সেটা মগজে কাজ শুরু করলো। কোনো চলতি আন্দোলনের সুযোগ নেওয়া থেকে একটা নয়া আন্দোলন সৃষ্টি করা বড় জোর এক ধাপ নীচে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার এবং দল হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে আহ্‌রাররা এই কৌশলই অবলম্বন করলো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বছর না ফিরতেই দু'জন নামজাদা আহরার নেতাকে আপত্তিজনক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার সন্দেহে পাঞ্জাব জন-নিরাপত্তা আইন বলে আটক করা হয়। এঁরা হলেন: মজলিস-ই-আহ্‌রার-ই-পাকিস্তানের সেক্রেটারী মখদুম শাহ্ বানাওরি এবং অন্যজন শেখ হুসামউদ্দীন। লম্বা-চওড়া জবানবন্দী দে'য়ার পরে এঁদের দু'জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

মেজর মাহ্‌মুদের হত্যা

১৯৪৮ সালের গরমের মওসুমে মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ বালোচিস্তানের কোয়েটাতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করছিলেন। তাঁর সেখানে থাকা কালে মেজর মাহ্‌মুদ নামক একজন অল্পবয়স্ক আহ্‌মদী সামরিক অফিসারকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এ-বছরের ১১ই আগষ্ট মুসলিম রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন একটি জনসভার আয়োজন করে। কয়েকজন মৌলবী এ-সভায় বক্তৃতা করেন এবং তাদের প্রত্যেকেরই বক্তব্য বিষয় ছিল খতমে-নবুওয়াত। এ-সব বক্তৃতায় কাদিয়ানীদের কাফেরী কার্যকলাপ এবং তা'র শাস্তির কথাও বলা হয়। সভা চলতে থাকা কালে একজন রোগীকে দেখার পর মেজর মাহ্‌মুদ এই পথে ঘরে ফিরছিলেন। সভা-স্থলের কাছে হঠাৎ তাঁর গাড়ী বিগড়ে যায়। গাড়ীটা আবার চালাবার চেষ্টা হলো; কিন্তু ফল হলো না। ঠিক এই সময়ে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক এসে মেজর মাহ্‌মুদকে গাড়ী থেকে টেনে বের করে। তিনি পালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাড়া করে ধরে' লোকেরা তাঁকে পাথর ও ছুরি মেরে হত্যা করে। তাঁর পেটের সমস্ত নাড়ি-ভূঁড়ি বেরিয়ে আসে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় তাঁর দেহে ভোঁতা ও ধারাল অস্ত্রের ছাব্বিশটি আঘাত ছিল। এই 'ইসলামী' বীরত্বের কৃতিত্ব স্বীকার করার মতো কাউকেই পাওয়া গেল না। চাক্ষুষ-দেখা বহু সাক্ষীর একজনও এই বীরত্বপূর্ণ কর্মের 'গাজীদের' সনাক্ত করতে পারল না বা চাইল না। সুতরাং অপরাধীরা রয়ে গেল অচেনা এবং সে কারণে মামলাটা গেল বাতেল হ'য়ে। পুলিশের নথি-পত্র থেকে দেখা যায়, উত্তেজিত জনতা হত্যা করার জন্যে খাটো দাঁড়িওয়ালা লোকদের হয়রান হয়ে খুঁজছিল। আহ্‌মদীরা খাটো দাঁড়ি রাখে।

২৭শে আগষ্ট শেখপুরা জেলার ভুল্লার গ্রামে উরুস উপলক্ষে এক বক্তৃতায় অন্যতম আহ্‌রার নেতা সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান বেগম লিয়াকত আলী খান এবং অন্য মেয়েরা যারা পর্দা মানে না তাদেরকে বেশ্যা বলে' বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেন যে, কায়েদে-আজম পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল হতে চেয়েছিলেন তাই পূর্ব-পাঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখদের দ্বারা এক লাখ মুসলমান মেয়ে অপহৃতা হলো।

আহ্‌মদীদের সংখ্যালঘু অমুসলিম ব'লে ঘোষণা করার দাবী সর্বপ্রথম জন-সমক্ষে করা হয় ১৯৪৯ সালের ১লা মে তারিখে পিণ্ডদাদন খানে অনুষ্ঠিত এক আহ্‌রার সভায়। এর পর থেকে আহ্‌রারদের সমস্ত সভা-সমিতির একমাত্র বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল আহ্‌মদীরা। শুধু আহ্‌মদী জামাতের নেতাদের গাল দিয়ে তা'রা ক্ষান্ত হলো না, পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকেও টেনে আনলো আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যের

ভেতর। এ-বছর নভেম্বর মাসের ছাব্বিশ ও সাতাশ তারিখে শিয়ালকোটে আহ্‌রারদের তবলীগ সম্মেলনে এগার হাজার শ্রোতার সামনে বক্তৃতায় প্রত্যেক আহ্‌রার নেতা আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তার নেতা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান এবং সমস্ত আহ্‌মদীদেরকে গাল দেন। এ-সব বক্তৃতার একটা নমুনা হচ্ছে মৌলবী মোহাম্মদ হায়াতের বক্তৃতা। তিনি বলেন: "আমরা মির্জা গোলাম আহ্‌মদকে দোষ দেই না, সে তো ঝুটা ছিলই; কারণ, সে কেবল মাঝে মাঝে কুমারী মেয়েদের সংগে সহবাস করতো। আমাদের অভিযোগ হলো বর্তমান খলিফার বিরুদ্ধে। কারণ, সে রোজই কুমারী মেয়েদের সংগে সহবাস করে।"

এ বক্তৃতার জন্যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কি-না সে-সম্পর্কে যে পুলিশ অফিসার তদন্ত করেন তিনি বলেন, এ-ধরনের বুলি রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ঝুলির স্বাভাবিক রসদ; এতে কারো গায়েই ফোস্কা পড়ে না।

আহ্‌লে-সুন্নাত-ওয়াল-জামাতের নামে নওশেহ্‌রা ভিরকানে অনুষ্ঠিত আহরারদের পরবর্তী জনসভায় মৌলবী গোলাম উল্লাহ্‌ খান মির্জা গোলাম আহ্‌মদকে দজ্জাল ব'লে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, ইসলামের সংহতি বানচাল করার উদ্দেশ্যেই নাকি বৃটিশরা তাকে গড়ে তোলে। তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, কাদিয়ানীরা—বিশেষ করে' চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান পাকিস্তান এবং মুসলিম জাতির সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করছেন এবং তা'রা নাকি কাদিয়ানের বদলে কাশ্মীরকে বিকিয়ে দে'য়ার বন্দোবস্ত করেছে। দণ্ডবিধি আইন ও পাঞ্জাব জন-নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংগত ব'লে গুপ্ত পুলিশ রিপোর্ট দেয়। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের আইন-উপদেষ্টার কাছে কেস্‌টি এলে তিনি মত দেন যে, আহরার নেতাদের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোনো শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই সমীচীন। কারণ, এর ফলে তা'দেরকে অযথা জনপ্রিয় ক'রে তোলা হ'বে। তিনি বলেন, তা'দের কার্যকলাপ আরো কিছুদিন সরকারের লক্ষ্য করা উচিত।

আহ্‌রারদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য তবলিগ সম্মেলন হয় ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লায়ালপুরে। এখানে প্রায় হাজার পাঁচেক শ্রোতার সামনে মৌলবী গোলাম গওস সরহদ্দি, কাজি এহসান আহমদ শুজাবদি, মৌলবী মোহাম্মদ আলী জলন্ধরী, শেখ হুসামুদ্দিন এবং মাষ্টার তাজুদ্দিন আনসারি যে-সব বক্তৃতা দেন, তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইন ও পাঞ্জাব জন-নিরাপত্তা আইন বলে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে গুপ্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করেন। এই কেস্‌ সম্পর্কে আইন-উপদেষ্টা এই মন্তব্য করেন:

> "শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা আহ্‌মদীদেরকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য করেছে। আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যে ধর্মীয় মনোভাব রয়েছে, তারই সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে তারা। আমার মতে, আহ্‌রারদের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই উচিত; কারণ মুসলমানরা আহমদী মতবাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। আহমদীদের গাল দেওয়ার জন্যে তা'দের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিলে জনসাধারণের চোখে তারা অযথা খানিকটা শাহাদত জাতীয় মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং বর্তমানে আহ্‌রার নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ আমি দিই না।"

কেস্‌টি যখন তৎকালীন পাঞ্জাবের গভর্ণর সরদার আবদুর রব নিশতারের কাছে আসে, তখন তিনি মন্তব্য করেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই আহ্‌রার নেতা মৌলবী গোলাম গওস সরহদ্দীকে এই ব'লে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সরকার অবশ্য কারও ধর্মীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দেবে না; কিন্তু শান্তি বিপন্ন করতে পারে এমন ধরনের বক্তৃতা কখনই সহ্য করা হবে না।

আহরারগণ তবলীগ সম্মেলন ডেকে ডেকে আহ্‌মদীদের গাল দেওয়ায় আহমদীরাও অজুহাত পেল তাদের নিজেদের সভা-সমিতি করার। এ-রকম একটা পাল্টা সভার অনুষ্ঠান করা হয় ১৯৫০ এর ১৫ই জানুয়ারী শিয়ালকোটে। আহরাররা অবশ্য ইট-পাটকেল ছুঁড়ে এই সভা ভেংগে দে'য়ার চেষ্টা করে এবং ফলে পুলিশকে মৃদু লাঠি চার্জ করতে হয়। পুলিশ সুপার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে আসেন এবং পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর সভার কাজ আবার শুরু হয়। কিন্তু সংগে সংগে এক বিরাট জনতা একটুখানি দূরে জমায়েত হয় এবং লাউড-স্পীকার লাগিয়ে চারজন ধৃত হাঙ্গামাকারীর মুক্তি এবং একজন অ-আহমদীকে ছুরিকাঘাতকারী একজন আহমদীর আত্মসমর্পণ দাবী করে।

ঐ মাসের ২৮ এবং ২৯ তারিখে মুলতানে যে তবলীগ সম্মেলন হয় তাতে বহু লোকের সমাগম হয় এবং কয়েকজন আহ্‌রার নেতা বক্তৃতা করেন। এ-সব বক্তৃতায় মির্জা গোলাম আহ্‌মদকে মাষ্টার তারা সিং-এর মতো ক'রে তুলনা করা হয় এবং চৌধুরী জাফরল্লাহ্‌ খানের প্রতি হীন ইঙ্গিত করা হয়। তাঁকে মুসলিম জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক ব'লেও বর্ণনা করা হয়। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা গোলাম আহমদ এবং এর বর্তমান প্রধানের বিরুদ্ধেও শালীনতা-বহির্ভূত অনেক কিছু বলা হয়। জেনারেল নাজির আহমদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য করা হয়। সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ্‌ বোখারী অভিযোগ করেন যে, মুলতানের ডেপুটী কমিশনার মুসলমানদের মসজিদ কেড়ে নিয়ে মির্জাইদের দিয়েছেন। এ-কেসটি আইন-উপদেষ্টার কাছে এলে তিনি আগের মতোই মন্তব্য করেন। কিন্তু গভর্ণর বলেন যে, ধর্মের নামে সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ক'রে রাষ্ট্রের মর্যাদা হানি করতে দেওয়া যেতে পারে না। তাঁর পরামর্শ অনুসারে আহ্‌রার মজলিসের সভাপতি মাষ্টার তাজুদ্দিনকে ডেকে সাবধান ক'রে দেওয়া হয় যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান ও জেনারেল নাজির আহ্‌মদের মতো উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ফল মঙ্গলজনক হবে না, এবং এই সাবধান-বাণী যদি উপেক্ষা করা হয় তবে আহ্‌রারদের বিরুদ্ধে খব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবেন।

আফঘানিস্তানে আহ্‌মদীদের পাথর মেরে হত্যা ও 'আশ্‌-শাহাব'

তদন্ত কমিশনের সামনে নেতৃস্থানীয় আলেমগণ যে মত প্রকাশ করেন, তদনুসারে ইসলামে ধর্ম-ত্যাগ (ইরতিদাদ) করার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। আহমদীরা যদি কাফের হয়, তবে কোনো লোক আহমদী হ'লে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হতে পারে। এই মতবাদ আফঘানিস্তানে দেশের আইনের অংশ হিসেবে প্রচলিত ব'লে মনে হয়। অনেক লোককে তাদের অনৈসলামিক মতবাদের দরুন চরম শাস্তি বরণ করতে হয়েছে। যে-সব আহমদী এই আইনের যাঁতা-কলে পড়ে, তাদের প্রথম হচ্ছে আবদুর রহমান খান নামক এক ব্যক্তি। আমীর আবদুর রহমান খানের রাজত্বকালে তাকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম আবদুল লতিফ। একে ১৯০৩ সালে আমীর হাবিবুল্লাহ্‌ খানের রাজত্বকালে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। আবদুল লতিফ ছিল আফঘান নাগরিক। কাদিয়ানে মির্জা গোলাম আহমদের সাহচর্যে কিছুদিন থাকার পর সে আহ্‌মদী মত গ্রহণ করে; ১৯০৩ সালে আফগানিস্তানে ফিরে গেলে আলেমরা তাকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে ফতোয়া দেন। ফলে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। জ্যান্তভাবে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। নেয়ামতউল্লাহ্‌ খান নামক আরেক ব্যক্তিকেও ঠিক একই ভাগ্যের সংগে মোলাকাত করতে হয়। আহ্‌মদী হওয়ার অপরাধে আফঘানিস্তানের আলেমরা তাকে মুরতাদ ব'লে ঘোষণা করেন এবং ১৯২৪ সালের ৩১শে আগষ্ট শেরকোটে তাকে জনসমক্ষে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

নেয়ামতউল্লাহ্ খানের প্রাণদণ্ডের ফলে ইসলামে ধর্ম-চ্যুতির শাস্তি কি সে-সম্পর্কে ভারতে কিছু মতভেদের সৃষ্টি হয়। দেওবন্দের বিজ্ঞ-আলেম মওলানা শাব্বির আহ্মদ ওসমানি বিষয়টির উপর 'আশ্-শাহাব' নামক একখানি পুস্তিকা লেখেন। এর প্রথম ভাগে দেখানো হয় যে, আহমদীরা মুরতাদ বা ধর্ম-চ্যুত, এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রমাণ করা হয় যে, ইসলামে ধর্ম-চ্যুতির যোগ্য শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড।

প্রায় তিরিশ বছর ধরে বইটি সম্পর্কে কারো বিশেষ কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। কিন্তু ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের কিছু আগে কাজী এহসান আহমদ শুজাবদি বইটি আবার ছাপিয়ে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লেখকের অনুমতি নেয়। লেখক তখন পাকিস্তানের 'শেখ-উল্-ইসলাম' হয়েছেন। এই অনুমতি দেওয়ায় আহ্রাররা তাদের বক্তৃতায় অহরহ এই বই থেকে উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে শুরু করলো এবং একে ফতোয়া ব'লে বর্ণনা করতে লাগলো। ঐ বছর এপ্রিল মাসের ১৪ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত রাওলপিণ্ডির কোম্পানী বাগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তা শ্রোতাদের কাছে আবেদন করেন যেন তারা 'আশ্-শাহাব' বইখানি কেনেন। এই বই প্রসংগে মাষ্টার তাজুদ্দিন আনসারীকে ডেকে গভর্ণর কড়া-ভাবে শাসিয়ে দেন। তবু কিন্তু আহ্রাররা জনসভায় তাদের বক্তৃতায় বইটিকে উদ্ধৃত করা বন্ধ করল না। অবশেষে যখন স্বরাষ্ট্র সচিব বইটি দেখলেন, তখন তিনি পাঞ্জাব সরকারকে অবিলম্বে এটা বাজেয়াফত করতে বললেন। বইটিতে যে মতবাদ প্রচার করা হয়েছে, তা'র ফলাফল চিন্তা ক'রে নিশ্চয়ই তিনি আঁৎকে উঠেছিলেন।

আরো হত্যা

'আশ্-শাহাব' বইটির যথেষ্ট প্রচার এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে আহরারদের বিদ্বেষ অভিযানের ফল যা হবার তা-ই হলো। মোহাম্মদ আশ্রাফ নামক উনিশ বছরের এক যুবক ওকারায় গোলাম মোহাম্মদ নামে একজন আহমদী স্কুল মাষ্টারকে হত্যা করলো। ১৯৫০ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে ওকারায় এক আহমদী-বিরোধী জনসভায় উস্কানিমূলক বক্তৃতা শুনে পরদিন সে রাস্তায় মাষ্টারকে ধরে হত্যা করে। ওকারায় এই হত্যার মাত্র কয়েকদিন পরেই রাওলপিণ্ডির বাগ গোয়ালমণ্ডিতে বদরউদ্দিন নামে আরেকজন আহমদীকে গুলী করে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি হত্যা করে তার নাম বেলায়েত খান। ঘটনাস্থলে ধরা পড়লে সে স্বীকার করে যে, বদরউদ্দিনকে হত্যা করার কারণ হচ্ছে যে, সে একজন আহ্মদী।

এ-সব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আহ্মদী জামাত তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও তা'রা লিখিতভাবে এ-প্রতিবাদ পেশ করে। কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব সরকারের কাছে জানতে চান যে, তাঁদের মতে প্রদেশে আহ্মদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কোনো হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে কি না। পাঞ্জাব সরকার জানান যে, না—সে-রকমের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তাঁরা আরও জানান যে, আহ্রাররা যদি মুসলিম লীগের সংগে সহযোগিতা করতে রাজি হয়, তবে তাদের এহেন কার্য-কলাপ আপনা আপনিই বন্ধ হ'য়ে যাবে।

(১৯৫১ সালের মার্চ মাসে, পাকিস্তান সরকারকে উচ্ছেদ করার এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। এতে উচ্চ-পদস্থ সামরিক অফিসারগণও জড়িত ছিলেন। এই মামলাকে 'রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা' বলা হয়। এই মামলায় যাঁরা অভিযুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে একজন আহ্মদী—মেজর জেনারেল নাজির আহমদও ছিলেন। পরেই এপ্রিল মণ্টেগোমারীতে এক জনসভায় মৌলবী মোহাম্মদ আলি জলন্ধরী বলেন যে, বিমান বাহিনীর

পাইলটদের শতকরা আশি জনই আহ্‌মদী; আহ্‌মদী অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়েছে রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র আবিষ্কারে; এই ষড়যন্ত্রের ফলে সরকারের হুঁশ হয়েছে; এবং আহ্‌মদীরা যে এই ষড়যন্ত্রের সংগে জড়িত সেটা প্রমাণ করার মতো দলিল তাঁর কাছে আছে। তিনি আরো বলেন যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান রাষ্ট্রের পয়সায় আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের প্রাসাদের ঠিক উল্টো দিকে একটা বিলাস-ভবন কিনেছেন, যাতে সেখান থেকে আমেরিকায় আহ্‌মদী মতবাদ প্রচার করা যায়।

শুকরিয়া দিবস

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোরে গৃহীত প্রস্তাবে আহ্‌রারগণ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, তা'রা তাদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলিম লীগকে সাহায্য করবে। তারা তখন আরো ঘোষণা করে যে, আগামী ইলেকশনে তারা মুসলিম লীগকে সমর্থন করবে, তবে মনোনীত প্রার্থী যেন আহ্‌মদী না হয়। ১৯৫০-র শীতের পয়লা দিকে পাঞ্জাবে ইলেকশন শুরু হয় এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয় ১৯৫১-র মার্চ মাসে। মুসলিম লীগ যথেষ্ট সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ কয়েকজন আহ্‌মদীকে তাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। কিন্তু এরা সবাই পরাজিত হয়। ইলেকশনের সময় আহ্‌রারদের কার্য-কলাপের কোনো নীতিগত মিল ছিল না। জনাব মুমতাজ দৌলতানার সাক্ষ্য অনুযায়ী দেখা যায়, আহ্‌রাররা কিছু মুসলিম লীগ প্রার্থীর সাহায্য করে সত্য, তবে আহ্‌মদী নয় এমন অনেক প্রার্থীর বিরোধিতাও করে। ১৯৫১ সালে এপ্রিলের গোড়ার দিকে জনাব দৌলতানার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ উজির-সভা গদি দখল করেন।

আইন পরিষদে কোনো আহ্‌মদী নির্বাচিত না হওয়ায়, আহ্‌রারগণ বিজয়-উৎসব হিসেবে এক 'শুকরিয়া দিবস' পালনের ঘোষণা করে। মার্চ মাস থেকে শুরু ক'রে মে মাস পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন তারিখে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই দিবস পালন করা হয়। লায়ালপুরে এ-দিবস পালন করা হয় ২০শে এপ্রিল। এ-উপলক্ষে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে গোলাম নবী জানবাজ একজন আহ্‌মদী দোকানদার ফজল দীনকে সাংঘাতিক পরিণামের ভয় দেখায়। ৭ই মে প্রকাশ্য দিবালোকে তার নিজের দোকানের ভেতর এই লোকটিকে আক্রমণ করা হয়। ১৩ই মে সমুন্দরীতে এক জনতা একটি আহ্‌মদী মস্‌জিদে আগুন লাগায় এবং যারা ভেতরে নামাজ পড়ছিল তাদের যথেচ্ছ মার-ধোর করে।

গুজরানওয়ালায় ২৯শে মার্চ তারিখে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় যে, পরের দিন শুকরিয়া দিবস পালন করা হবে। বিজ্ঞাপনের ধরন এমন ছিল যে, ফলে একজন আহ্‌মদীর সংগে একজন অ-আহ্‌মদীর ধস্তাধস্তি লেগে যায় এবং অ-আহমদী ব্যক্তি আহত হয়।

লাহোরে ২৫শে ও ২৬শে মে এই দিবস পালন করা হয়। ইতোপূর্বে আহ্‌রারগণ আহ্‌মদীদের রাওল-পিণ্ডি ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ করায় এবং বিশেষ ক'রে মেজর জেনারেল নাজির আহমদের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করায় কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ব্যাপারটির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে-জন্যে আগেই আহ্‌রারদের সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার। তাদেরকে বলা হয় যে, এ-ধরনের বল্গাহীন অভিযোগের ফলে নির্দোষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলা হবে এবং যে ব্যক্তি এ-ধরনের অভিযোগ করবে সে বিচারকারী আদালতের অবমাননা করার দোষে অভিযুক্ত হতে পারে।

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

উৎসবের পয়লা দিনে সারা পাঞ্জাব থেকে এবং সীমান্তের পেশওয়ার ও হরিপুর হাজারা জেলা থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এসে একটি মিছিল ক'রে লাহোরের রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করে। মিছিলের সংগে পাঁচটি বাজনা-দল ছিল। সন্ধ্যায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়। তাতে মুসলিম লীগ এম, এল, এ, এবং লীগের পদস্থ লোক-সহ বেশ কয়েকজন নামজাদা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতায় সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান দাবী করেন যে, আহ্‌মদীদের সংখ্যালঘু শ্রেণী ব'লে ঘোষণা করা হোক, না হ'লে তাদেরকে এ-দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হোক; তারা গিয়ে ভারতে বস-বাস করুক। সভাপতি মওলানা আহমদ আলি আহ্‌মদী-দেরকে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ থেকে সরিয়ে দে'য়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি দাবী জানিয়ে এক প্রস্তাব উথাপন করেন। সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী মেজর জেনারেল নাজির আহমদের আটকের উল্লেখ ক'রে বলেন যে, এই আটক শুকরিয়া দিবসকে গর্বের দিবসে পরিণত করেছে; কারণ, সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে রাষ্ট্র রক্ষা পেয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক হাল্কা রসিকতায় তিনি বলেন যে, মেজর জেনারেল নাজির আহমদকে নেংটা ক'রে ফেলা হয়েছে, এবং আহ্‌মদীদের কাজ হচ্ছে তার জন্যে আরেকটি পায়জামার ব্যবস্থা করা। তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, মেজর জেনারেল নাজির আহ্‌মদকে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দে'য়ার উস্কানি দেয় মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ। শ্রোতাদেরকে বোখারী এই সব শ্লোগান আওড়াতে বলেন:

> "পাকিস্তানের নেমক-হারাম মুর্দাবাদ", "পাকিস্তানের গাদ্দার মুর্দাবাদ", "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "মির্জা বশিরউদ্দিন মুর্দাবাদ", "মির্জাবাদ মুর্দাবাদ"।

২৬শে মে তারিখের সভায় কাজী এহ্‌সান আহ্‌মদ শুজাবদি আবার রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপার উল্লেখ করেন। শেখ হুসামউদ্দিন ঘোষণা করেন যে, আহমদীরা জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধক; সুতরাং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। তিনি এবং আল্লামা আলাউদ্দিন সিদ্দিকী চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সম্পর্কে যা-তা মন্তব্য করেন এবং তাঁকে মন্ত্রীত্বের পদ থেকে সরিয়ে দে'য়ার দাবী করেন। ঐদিনও এক মিছিল বের করা হয়।

এ-সভার বক্তৃতার বিবরণ উজিরে 'আলার কাছে এলে তিনি মন্তব্য করেন:

> "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা 'বাঁচবার জায়গা' দখল করার জন্যে আহ্‌রাররা এই ব্যাপারটির সুযোগ নিচ্ছে। ব্যাপারটির প্রতি সাধারণ মুসলমানদের স্বভাবতঃই আগ্রহ রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এটা সীমা ছাড়িয়ে না যায়।"

আহ্‌মদী মস্‌জিদ জ্বালানো

১৩ই মে তারিখে লায়ালপুর জেলার সমুন্দরি শহরে একদল আহ্‌রার আহ্‌মদীদের একটি মসজিদ জ্বালিয়ে দেয় এবং যে-সব আহ্‌মদী সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের মার-পিট করে। এ-ব্যাপারে বিশ জন লোককে আটক করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

আহ্‌রারগণ এর পরে আরো কয়েকটি সভায় চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান ও আহ্‌মদী জামাতকে আক্রমণ ক'রে বক্তৃতা দেয়। পাঞ্জাব সরকারের কড়া সাবধান-বাণী সত্ত্বেও এ-ধরণের প্রচার-কার্য চলতে থাকে।

এই দলগত কলহ এবং আহ্‌মদী ও তাদের নেতাদের প্রতি বারবার আক্রমণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তখন উদ্বেগ বোধ করতে শুরু করেন। ৭ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-দফ্‌তর হ'তে পাঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারীর নিকট একটি পত্র প্রেরিত হয়। তাতে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, যদিও কোনো জামাত বা দলের ধর্মীয় মতামত প্রচারের ন্যায্য অধিকার অকারণে খর্ব করা উচিত নয়, এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা হবে না, তবুও ধর্মীয় কলহকে একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং শান্তি ভংগের কারণ হতে পারে এ-রকম পর্যায়ে কখনই যেতে দেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, যুদ্ধং-দেহি বা উচ্ছৃংখল ধরনের ধর্মীয় কলহ কড়া হাতে দমন করতে হবে।

ঠিক এই সময়ে সাম্প্রদায়িক কলহ আরো কদর্য রূপ গ্রহণ করে। কয়েক জায়গায় শিয়া-সুন্নী মতভেদ আত্মপ্রকাশ করে এবং বাড়তে থাকে। লাহোরের কৃষ্ণ নগরে একটি ইমামবাড়া তৈরি করা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ভাকুকার থেকে খবর আসে যে, তাজিয়া মিছিল বের হলে গোলযোগের বিশেষ আশংকা রয়েছে। লাহোর থেকে মাইল সাতেক দূরে শাহ্‌পুর কাঞ্জরায় এক শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা হয়। এতে দু'জন শিয়া নিহত হয়—একজন স্ত্রীলোক এবং একটি তিন বছরের ছেলে।

৩রা নভেম্বর সমস্ত ব্যাপারটি পর্যালোচনা ক'রে পাঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারী সমস্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারদের নির্দেশ দেন যে, বেপরোয়া সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যেখানেই শান্তি ভংগের আশংকা দেখা দেয়, সেখানেই যেন দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই নির্দেশের পর এক পক্ষকালের মধ্যেই লায়ালপুরের পুলিশ সুপার বেতার-যোগে খবর দেন যে, আহ্‌রাররা আহ্‌মদীদের এক সিরাতুন্নবী সভা ভেংগে দিয়েছে এবং দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে উভয় দিকেই কয়েকজন লোক আহত হয়েছে।

মণ্টগোমারী জেলার ওকারায় নভেম্বর মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখে আহ্‌রারদের এক খতম-ই-নবুয়াত সম্মেলনে কাজী এহ্‌সান আহ্‌মদ সুজাবদি অভিযোগ করেন যে, গত মাসে রাওলপিণ্ডিতে কায়েদে মিল্লাত জনাব লিয়াকত আলী খানের হত্যায় আহ্‌মদীদের হাত ছিল।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিয়ালকোটে আহ্‌মদিয়া জামাত নিজেদের প্রাঙ্গণে একটি তবলীগ সম্মেলন করতে চায়। এটা নিষিদ্ধ করার জন্যে আহ্‌রাররা সাধ্যমতো চেষ্টা করে; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে এক বিরাট জনতা-সহ তা'রা সভাস্থলের দিকে এগিয়ে যায় এবং পুলিশের বেড়া ভেংগে সভা পণ্ড করার চেষ্টা করে। "বনস্পতি নবী মুর্দাবাদ", "মির্জাইদের সভা বন্ধ করো", "কাফেরদের সভা বন্ধ করো" এই সব শ্লোগানও তারা দেয়। সভা পণ্ড করতে না পেরে, সভার পরে আহ্‌মদিরা যখন ঘরে ফিরছিল তখন তাদের প্রতি তারা ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। এই ঘটনায় দু'জন কনেষ্টবল আহত হয়।

আহ্‌রারদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপ বিবেচনা ক'রে জুন মাসের পাঁচ তারিখে পাঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারী সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট এক নির্দেশ দেন যে, জনসাধারণের শান্তির খাতিরে আহ্‌রার বা আহ্‌মদী কোনো দলকেই যেন কোনো প্রকার সভা-সমিতি করতে দেওয়া না হয়। এ-সব সভা-সমিতি যেন অবশ্যই নিষিদ্ধ করা হয়।

এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু হলে আহ্‌রারগণ নতুন কৌশল অবলম্বন করলো। তারা তখন মসজিদে মসজিদে জুমা'র নামাজের আগে বা পরে তাদের সভা করতে শুরু করলো। এতে তাদের যথেষ্ট শ্রোতা মিলতে লাগলো। প্রাদেশিক সরকার নতুন এক নির্দেশে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের বললেন যে,

মসজিদেও এ-ধরণের সভা-সমিতি বন্ধ করতে হবে—তবে এর পবিত্রতার প্রতি খেয়াল রেখে' সাবধানতার সংগে এবং পরোক্ষ উপায়ে। মসজিদকে ১৪৪ ধারার আঁওতায় আনা সত্ত্বেও আহ্‌রাররা মসজিদে সভা করতে থাকে এবং এই অপরাধে দু'চারটি ধরপাকড় ও মামলা দায়ের করা হলে তারা প্রচার করতে শুরু করে যে, মস্‌জিদের ভেতর নির্জলা ধর্মীয় কার্যকলাপের জন্যে মুসল্লীদের ধর-পাকড় করা হচ্ছে এবং মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং এতে ক'রে সরকার জনসাধারণের ধর্ম পালন ও বিশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করছে। ধর্মের নামে মস্‌জিদে যা-ইচ্ছে তাই করার অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে আহ্‌রারগণ এই ধরনের প্রচার চালাতে থাকে।

ঠিক এই স্থলে তারা আলেমদের সমর্থন লাভে সফলকাম হয়। এ-জন্যে ১৯৫২ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে তারা লাহোরে সমস্ত মুসলিম দলগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং প্রচার করে যে, খতম-ই-নবুয়াত ব্যাপারটি মুসলমানদের সকল মতাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের জন্যে এক সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

করাচী জাহাঙ্গীর পার্কে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌র বক্তৃতা

করাচীর আহ্‌মদীয়া আন্‌জুমান এক বিজ্ঞাপন প্রচার করে যে, জাহাঙ্গীর পার্কে ১৭ই এবং ১৮ই মে তারিখে তা'রা এক সভার অনুষ্ঠান করবে এবং সেখানে বক্তাদের মধ্যে পররাষ্ট্র উজির চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানও থাকবেন। আহ্‌মদীয়া আন্‌জুমানের দ্বারা ডাকা হলেও এটা ছিল জনসভা ; কেননা, কাউরই সেখানে উপস্থিত থাকায় বাধা ছিল না। সভার কয়েকদিন আগে উজিরে-আজম খাজা নাজিমুদ্দিন জানান যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের পক্ষে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনসভায় যোগদান করাটা তিনি পছন্দ করেন না। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান খাজা নাজিমুদ্দিনকে বলেন যে, তিনি আন্‌জুমানকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তবে তাঁকে যদি আগেই পরামর্শ দে'য়া হতো, তা'হলে তিনি যোগদান করতেন না। কথা দিয়ে ফেলার জন্যে সভায় এখন বক্তৃতা করা তিনি তাঁর কর্তব্য ব'লে মনে করেন। কিন্তু উজিরে-আজম যদি নাছোড় হন তবে তিনি তাঁর পদত্যাগ-পত্র দাখিল করতে রাজি আছেন।

সভার পয়লা অধিবেশনের সময় জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সভার কাজে বাধা দে'য়ার চেষ্টাও হয়। ১৮ই মে তারিখে অবশ্য শৃংখলা রক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই দিন চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান 'ইসলাম প্রাণবন্ত ধর্ম' এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। বিশ্ব-ধর্ম হিসেবে ইসলামের মর্যাদা উচ্চতর এবং ইসলামই শেষ, এই মূল ভাবের উপর এটি একটি সারগর্ভ বক্তৃতা। তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেন : কোরানই হচ্ছে নাজেল করা শেষ কেতাব। মানব সমাজের কল্যাণের জন্যে এতে আছে চরম নির্দেশ—পরবর্তী কোনো নির্দেশই একে বাতিল করতে পারবে না। ইসলামের নবীই হচ্ছেন শেষ নবী এবং তিনিই খোদার শেষ বাণী মানব-সমাজের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন এবং কোরানে যে আইন আছে তাকে বাতিল করবার মতো বা পরিবর্তিত করবার মতো কোনো আইন নিয়ে কোনো দিনই কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। ধর্মের 'তাজদিদ' বা পুনর্জাগরণের জন্যে আল্লাহ্ তা'লা কোনো কোনো লোককে ভার দেবেন ব'লে যে অঙ্গীকার আছে, শুধু সেই প্রসংগেই তিনি আহ্‌মদী মতবাদের উল্লেখ করেন। ধর্মের মৌলিকতা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে এঁরা মূল ধর্মের সংস্কার ও সংশোধন করবেন এবং যদি ভুল-ত্রুটী বা আগাছা-পরগাছা জন্মে থাকে তবে সেগুলো দূর করবেন। তিনি দাবী করেন যে, মির্জা গোলাম আহ্‌মদ এ-রকম একজন সংস্কারকারী। বক্তৃতার উপসংহারে

তিনি বলেন যে, আহ্‌মদীয়াত স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে লাগান একটি গাছ এবং কোরানের অঙ্গীকার অনুযায়ী ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার স্বীকৃতি হিসেবে এ-গাছ শিকড় মেলেছে। এ-গাছ যদি তুলে ফেলা হয়, তবে ইসলাম আর জিন্দা ধর্ম থাকবে না—শুক্‌নো মরা গাছের মতো হয়ে যাবে, এবং তা'হলে অন্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রমাণযোগ্য কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। আহ্‌মদীয়া আন্‌জুমানের এই সভা করাচীতে দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ আগেই জানতে পেরেছিলেন যে, সভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা হবে। তাই শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করা হয়। ১৭ই মে সভা পণ্ড করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি লোক শ্রোতাদের প্রতি ইট-পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। ঐ দিন পনের জন কনেষ্টবল আহত হয়; তবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়। দাঙ্গাকারীদের আটক করা হয় এবং সভার কাজ চলতে থাকে। পরের দিন সভার চতুর্দিকে একদল লোক জড় হয়। কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভংগ করতে হয়। একদল দাঙ্গাকারী আহ্‌মদী হোটেল 'শেজানে' গিয়ে বাইরের কাঁচ ভেঙে ফেলে এবং দালানে আগুন লাগাবার চেষ্টা করে। এক আহ্‌মদী মালিকের 'শাহ্‌নাওয়াজ মোটরস্‌'-এর শো-রুমে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং একটি নতুন গাড়ীর ক্ষতি করা হয়। বন্দর রোডে আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী এবং একজন আহ্‌মদীর কাঠের আসবাব তৈরির দোকান জ্বালিয়ে দে'য়ার চেষ্টা করা হয়। ঐ-দিন ষাট জন লোককে গ্রেফতার করা হয়। দাঙ্গার পরে করাচীর চীফ কমিশনার জনাব এ, টি, নকভি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন যে, তাঁর শাসন-নীতি হচ্ছে যে, পাকিস্তানের প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম-বিশ্বাসে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং ভবিষ্যতে এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রচেষ্টাই সহ্য করা হবে না।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানের এই বক্তৃতা দানে করাচীতে এবং পাঞ্জাবে সাধারণ মুসলমানগণ গভীর এবং ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

নিখিল পাকিস্তান সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন

জাহাঙ্গীর পার্কে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানের বক্তৃতার পর মওলানা লাল হোসেন আখতার করাচীর থিওসফিক্যাল হলে পাকিস্তানের সকল মুসলিম দলের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের জন্যে যাঁদের দস্তখতে দাওয়াত পাঠানো হয় তাঁরা হচ্ছেন: মওলানা এহ্‌তিশামুল হক থানভি, মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনি, মওলানা জাফর হোসেন মুজতাহিদ, মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ এবং মওলানা লাল হোসেন আখতার। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় আহ্বায়কের বাড়ীতে ২রা জুন তারিখে। এর কার্যাবলী তদন্ত আদালতের সামনে পেশ করা হয়নি; তবে মওলানা এহ্‌তিশামুল হক যে-সব কাগজ-পত্র দাখিল করেছেন, তা' থেকে দেখা যায় যে, সম্মেলনে এই দাবীগুলো প্রণয়ন করা হয়:

১। আহ্‌মদীদের অমুসলিম-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব'লে ঘোষণা করা হোক;
২। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান্‌কে পররাষ্ট্র-উজিরের পদ থেকে সরিয়ে দে'য়া হোক;
৩। সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে আহ্‌মদীদের সরিয়ে দে'য়া হোক; এবং
৪। এই দাবীগুলো হাসিলের জন্যে পাকিস্তানের সকল মুসলিম দলগুলোর এক সম্মেলন আহ্বান করা হোক।

এ-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা সৈয়দ সুলেমান নদভী এবং তাঁরই নেতৃত্বে পরবর্তী সম্মেলনের ব্যবস্থাদি করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হয়। তাতে যে-সব প্রস্তাব পাশ করা হয়, সেগুলো করাচীতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অনুমোদন করা হয়।

বোর্ডের সদস্য ছিলেন ঃ

১। সৈয়দ সুলেমান সাহেব নদভী, তা'লিমাত-ই-ইসলামী বোর্ডের সভাপতি ;
২। মুফতি মোহাম্মদ শফি সাহেব, তা'লিমাত-ই-ইসলামী বোর্ডের সদস্য ;
৩। মওলানা আবদুল হামিদ সাহেব বাদাউনি ;
৪। আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব কালকাত্তাভি ;
৫। আল্লামা মুফতি দাদ সাহেব ;
৬। আল্লামা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব ;
৭। আল্লামা আহ্‌মদ নূরানী সাহেব ;
৮। মওলানা লাল হোসেন আখ্‌তার সাহেব ;
৯। আল-হাজ্ব হাশিম গাজদার সাহেব ;
১০। মওলানা জাফর হোসেন সাহেব মুজতাহিদ, তা'লিমাত-ই-ইসলামী বোর্ডের সদস্য ; এবং
১১। মওলানা এহ্‌তিশামুল হক—আহ্বায়ক।

১৩ই জুলাই জনাব মোহাম্মদ হাশিম গাজদারের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বোর্ডের এক সভায় পরবর্তী সম্মেলনের জন্যে নিম্নের দলগুলিকে দাওয়াত দে'য়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঃ

১। জমিয়াতুল-উলামায়ে-পাকিস্তান ;
২। জমিয়াতুল-উলামায়ে-ইসলাম ;
৩। জামাত-ই-ইসলামী ;
৪। তানজিম-ই-আহল-ই-সুন্নাতুল জামাত ;
৫। জমিয়াত-ই-আহ্‌ল-ই-সুন্নাত ;
৬। জমিয়াত-ই-আহ্‌ল-ই-হাদিস ;
৭। মোতামার-ই-আহল-ই-হাদিস, পাঞ্জাব ;
৮। ইদারা-ই-তাহাফ্‌ফুজ-ই-হাকুক-ই-শিয়া, পাঞ্জাব ;
৯। সাফিনাতুল মুসলেমিন ;
১০। হিজবুল্লাহ্‌, পূর্বপাকিস্তান ;
১১। মজলিস-ই-তাহাফ্‌ফুজ-ই-খতম-ই-নবুয়াত ;
১২। মজলিস-ই-আহরার ;
১৩। জমিয়াতুল ফালাহ্‌ ;
১৪। জমিয়াতুল আরাবিয়া ;

সম্মেলনের তারিখ ঠিক করা হয় ১৬ই এবং ১৭ই আগষ্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালের ১৬ই থেকে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত।

লাহোরে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন

করাচীতে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানের বক্তৃতার পর ঘটনার চক্র দ্রুতগতিতে ঘুরতে শুরু করে। আহ্‌রারগণ বহু-প্রতীক্ষিত এই সুযোগের পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করে। খতম-ই-নবুয়াত মতবাদের সুরক্ষার জন্যে

প্রাথমিক কার্যপন্থা নির্ধারণ করতে লাহোরে ১৩ই জুলাই সমস্ত ধর্মীয় দলের এক সম্মেলন ডাকা হয়। প্রায় ষাট জন ধর্মীয় নেতাকে এতে দাওয়াত দেওয়া হয়। করাচী থেকে মওলানা এহ্‌তিশামুল হক থানভি, মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনি এবং সৈয়দ সুলেমান নদভী-ও এতে যোগদান করেন।

শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকলেও কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে বাধা দে'য়া ঠিক হবে না। সম্মেলনে এই তিনটি দাবী গ্রহণ করা হয়ঃ আহ্‌মদীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব'লে ঘোষণা করা হোক; চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানকে পররাষ্ট্র-উজিরের পদ থেকে সরিয়ে দে'য়া হোক এবং রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে আহ্‌মদীদের সরিয়ে দে'য়া হোক। ভবিষ্যৎ কর্ম-ধারা নির্দিষ্ট করার জন্যে এতে একটি মজলিস-ই-আমল বা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। এতে ছিলেনঃ

১। মওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহমদ, জমিয়াতুল-ওলামায়ে-পাকিস্তান, (সভাপতি);
২। মওলানা আমিন আহসান ইসলাহি, জামাত-ই-ইসলামী (সহ-সভাপতি);
৩। মাষ্টার তাজুদ্দিন আন্‌সারী, মজলিস-ই-আহরার;
৪। শেখ হুসামুদ্দিন, মজলিস-ই-আহরার;
৫। মওলানা আবদুল হালীম কাসিমী, জমিয়াতুল-ওলামায়ে-ইসলাম;
৬। মওলানা মোহাম্মদ তোফায়েল, জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলাম;
৭। মওলানা মোহাম্মদ বক্স মুসলিম, জমিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তান;
৮। মওলানা গোলাম মোহাম্মদ তারান্নুম, হিজ্‌বুল আহ্‌নাফ;
৯। মওলানা গোলাম দীন, হিজবুল আহ্‌নাফ;
১০। মওলানা দাউদ গজনভি, জামিয়াতুল-আহ্‌লে-হাদিস;
১১। মওলানা আতাউল্লাহ্‌ হানীফ, জামিয়াতুল-আহ্‌লে-হাদিস;
১২। মওলানা নসরুল্লাহ্‌ খান আজীজ, জামাত-ই-ইসলামী;
১৩। হাফিজ কিফায়াত হোসেন, ইদারা-ই-তাহাফ্‌ফুজ-ই-হাকুক-ই-শিয়া;
১৪। মুজাফ্‌ফার আলি শামসী, ইদারা-ই-তাহাফ্‌ফুজ-ই-হাকুক-ই-শিয়া;
১৫। মৌলবী নুরুল হাসান বোখারী, তানজিম-ই-আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামাত;
১৬। সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান, আন্‌জুমান সাজ্জাদা নাশিনান-ই-পাঞ্জাব;
১৭। মওলানা আবদুল গফ্‌ফার হাজারভি, আন্‌জুমান সাজ্জাদা নাশিনান-ই-পাঞ্জাব;
১৮। আল্লামা আলাউদ্দিন সিদ্দিকী, (পরে গৃহীত);
১৯। মওলানা আখ্‌তার আলি খান, (পরে গৃহীত); এবং
২০। মওলানা মুর্তজা আহ্‌মদ খান মাইকাশ, (পরে গৃহীত)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলেমদের কার্যকলাপ এবং প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা

কাদিয়ানী আন্দোলনের গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রথম যিনি উজিরে আজম খাজা নাজিমুদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি হচ্ছেন কাজী এহ্সান আহ্মদ সুজাবদি। কাদিয়ানিয়াতের বিরোধিতা করাই মনে হয় এই লোকটির জীবনের একমাত্র বৃত্তি। যেখানেই যান, সাথে থাকে একটা বড় কাঠের বাক্স—আহ্মদিয়া ও আহ্মদিয়া-বিরোধী বই-পুস্তকে সেটি ভরা। পাকিস্তানের বা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের কোনো আপদ-বিপদ ও দুর্ঘটনা হলেই, এমন কি কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলি খানের হত্যা এবং বিমান দুর্ঘটনা পর্যন্ত সুজাবদির মতে আহ্মদিদের কীর্তি। ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে গিয়ে দেশে আহ্মদিদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা বিদ্যমান সে-সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার জন্যে করাচীর আলেম মওলানা এহ্তিশামুল হককে রাজি করাতে সুজাবদি সমর্থ হন। এঁরা দু'জনে ৩রা মার্চ তারিখে খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে সাক্ষাৎ করেন। সুজাবদি অবশ্য তাঁর বড় কাঠের বাক্সটি সাথে নিতে ভুলেননি। তিনি বাক্স থেকে বের ক'রে কতকগুলি কাদিয়ানী বই খাজা নাজিমুদ্দিনকে দেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এ-সব বই পড়ে' রীতিমত ভড়কে যান।

এর আগেই বলা হয়েছে, ১৯৫২ সালের জুন মাসের কোনো এক সময়ে করাচীতে বসে' এবং জুলাই মাসের ১৩ তারিখে লাহোরে বসে' আলেমরা আহ্মদিদের বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়া তৈরী করেন। লাহোরের বৈঠকে তাঁরা এই দাবী-দাওয়া আদায়ের উপায় নির্ধারণের জন্যে একটি সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করেন।

সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যগণ যে-সব পন্থা বের করেন তা'র একটা ছিল যে, খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে দেখা ক'রে এই-সব দাবী-দাওয়ার যোক্তিকতা সম্পর্কে তাঁকে রাজি করানো। জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে প্রথম মওলানা আখ্তার আলি খান উজিরে-আজমের সংগে দেখা করেন। এক সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষে মওলানা তখন করাচীতে। উজিরে আজমকে দাবীগুলো জানিয়ে মওলানা দেখ্ছিলেন কি প্রতি-ক্রিয়া হয়। মওলানা কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন, তাতে নাকি উজিরে আজম তাঁকে যা বলেন, তারই হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। উজিরে আজম নাকি বলেন:

> "দেশের মনোভাব এবং ইচ্ছা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। আমি জানি মুসলমানেরা কি চায়। আমি তাদের জানাতে চাই যে, সরকার তাদের ইচ্ছার পুরোপুরি কদর করেন; কিন্তু তাদের দাবী গ্রহণের পথে কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা রয়েছে। এ-অসুবিধাগুলো দূর করতে কিছু সময়

লাগবে। সুতরাং, মুসলমানদের উচিত অপেক্ষা করা এবং শান্ত থাকা। আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে তাদের উচিত সরকারের সংগে হাত মিলানো। আমরা যা-ই সিদ্ধান্ত নিই, মুসলমানদের কাছে সেটা গ্রহণীয় হবে। সে-সিদ্ধান্ত আলেমদের ইচ্ছার সংগেও পুরোপুরি খাপ খাবে। ১৪ই আগষ্ট আমার সরকার তাঁদের মৌলিক নীতি ঘোষণা করবেন। আমি আশা করি, আমার এই বিবৃতি জনসাধারণের কাছে সন্তোষজনক বলে গণ্য হবে।''

এই সাক্ষাতে কি কথা-বার্তা হয়েছিল সে-সম্পর্কে খাজা নাজিমুদ্দিন যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটা অন্যরকম। তিনি বলেছেন, মওলানা আখ্‌তার আলিকে তিনি কেবল এই কথাই বলেন যে, ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান দিবসে তিনি তার বক্তৃতায় এ-ব্যাপারটি সম্পর্কে যা বলার আছে, তা পেশ করবেন।

করাচী থেকে ফিরে এসে মওলানা আখ্‌তার আলি খান তাঁর নিজস্ব উর্দু দৈনিক পত্রিকা 'জমিন্দার'-এর ৪ঠা আগষ্ট সংখ্যায় খুব বড় বড় হরফে ছাপিয়ে দিলেন যে, কাদিয়ানিদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি উজিরে আজম তাঁর পাকিস্তান-দিবস বক্তৃতায় ঘোষণা করবেন এবং এ-ঘোষণা শরিয়ত এবং আলেমদের ইচ্ছার সংগে মিল রেখেই করা হবে। এই সংবাদে মওলানা মিছামিছি প্রকাশ করেন যে, তিনি এই সাক্ষাতে খত্‌ম-ই-নবুয়াত আন্দোলন সম্পর্কে এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। আসল ঘটনা হচ্ছে, কোনো এক সাংবাদিক সম্মেলনের সদস্য হিসেবে মওলানা করাচী যান এবং সেই সম্পর্কে সম্মেলনের আরো কয়েকজন সদস্য সহ খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে সাক্ষাৎ করতে যান। আহ্‌মদিদের বিষয়টি নেহায়েৎই প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা হয়।

১৩ই আগষ্ট মাষ্টার তাজুদ্দিন আনসারী, মওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহ্‌মদ, মওলানা মুরতজা আহ্‌মদ খান মাইকাশ, শেখ হুসামুদ্দিন, মওলানা এহ্‌তিশামুল হক থানভি এবং মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনি উজিরে আজমের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁদের বল্‌লেন যে, আগামী কাল পাকিস্তান দিবসের ব্যাপারে তিনি আপাততঃ ব্যস্ত; তাই ব্যাপারটি আলোচনার জন্যে যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে নেই; অতএব তাঁরা যেন অবসর দেখে পরে আসেন। পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে তাঁর বেতার-বক্তৃতায় উজিরে-আজম আহ্‌মদিদের বিষয়ে বা তাদের বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়ার বিষয়ে একটি কথাও বল্‌লেন না। বরং প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করলেন যে, যারা খবরের কাগজে মিথ্যা গুজব রটাচ্ছে তারা দুশমন এবং ভেতরে যে-সব বিভেদ-সৃষ্টিকারী কাজ করছে, বাধা না পেলে তা'রা দেশ ধ্বংস ক'রে ছাড়বে।

সেই দিনই কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নের এই অস্পষ্ট নির্দেশ-বাণীটি প্রচার করেন:

''পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় উজির সভার কোনো সদস্যই সরকারী পদ-মর্যাদার সুযোগ নিয়ে তাঁর সংশ্রবে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে কোনো দলীয় মতবাদ প্রচার করতে পারবেন না। প্রত্যেক গভর্ণরকে নির্দেশ দে'য়া হচ্ছে যাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট উজিরদের জানিয়ে দেন। আশা করা যাচ্ছে, কোনো উজিরই ভবিষ্যতে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন না।

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

"পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রায়ই অভিযোগ আস্‌ছে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কোনো কোনো কর্মচারী তাঁদের সরকারী পদ-মর্যাদার সুযোগ নিয়ে অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এবং যাঁরা সরকারী কার্য-সূত্রে তাঁদের সংযোগে আসেন তাঁদের মধ্যে দলীয় মতবাদ প্রচার করছেন। সরকার ব্যাপারটি খুবই আপত্তিজনক বলে মনে করেন এবং অবিলম্বে এ-ধরণের কার্য-কলাপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করেছেন। ভবিষ্যতের জন্যে এ-প্রকার আপত্তিজনক ভাবে দলীয় মতবাদ প্রচার নিষিদ্ধ ক'রে দে'য়া হচ্ছে।

"সরকারী চাকুরীয়াদের পালনীয় নিয়মাবলী অনুরূপভাবে সংশোধন করা হচ্ছে।

"সরকার জানিয়ে দিতে চান, কেউ এই নিয়ম ভংগ করলে, সে যে-কোনো সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, তা'র বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে পাকিস্তানের প্রাদেশিক এবং রাজ্য সরকার-সমূহকেও নির্দেশ দে'য়া হয়েছে।"

সাধারণভাবে লোকে বুঝলো যে, এই নির্দেশের লক্ষ্য হচ্ছে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান এবং অন্যান্য আহ্‌মদী অফিসারগণ। অতএব চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সংগে সংগে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বল্‌লেন যে, দলীয় মতবাদ প্রচারের জন্যে পদ-মর্যাদার অপব্যবহার করা তিনি একান্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করেন এবং এটা ইসলামের নীতিরও বিরুদ্ধে। যে-সম্প্রদায়ের লোকদের এমনিতেই লোকে ঘৃণা করে এবং উৎপীড়ন করে, তা'রা এ-ধরণের কাজ করলে রেহাই পাবে কি ক'রে! তিনি এই নির্দেশকে সমর্থন করছেন এবং আশা করছেন যে, এর ফলে সব সম্প্রদায়ের ভেতর শান্তি বিরাজ করবে এবং পরস্পরের মতের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হবে।

মজলিস্-ই-আমল বা সংগ্রাম-পরিষদের যে-সব সদস্য ১৩ই আগষ্ট খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁরা আবার ১৬ই আগষ্ট তাঁর সংগে দেখা করেন। সেইদিনকার সাক্ষাতে সরদার আবদুর রব নিশতার, জনাব গুরমানি এবং জনাব ফজলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতের ফলাফল মওলানাদের পক্ষে নেহাতই নৈরাশ্যজনক হলো। খাজা নাজিমুদ্দিন বল্‌লেন, আহ্‌মদিদের সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করা উচিত কি-না, সে সিদ্ধান্ত করবেন গণ-পরিষদ এবং এ-ব্যাপারে তিনি নিজে পা বাড়াতে রাজি নন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকে নিয়োগ করেছিলেন কায়েদে আজম স্বয়ং; সুতরাং তিনি তাঁকে পদিচ্যুত করবেন না। দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে আহ্‌মদী অফিসারদের সরানো সম্পর্কে তিনি বল্‌লেন, সাক্ষাৎকারীদের উচিত যুক্তিসংগত অভিযোগ তৈরী করা। 'রাবওয়াহ্' সম্পর্কে বল্‌লেন, তাঁরা তাঁদের অভিযোগ প্রাদেশিক সরকারের কাছে পেশ করতে পারেন।

একদল মওলানা ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের উজিরে-আলার সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে দাবী-দাওয়া, রাবওয়াতে একটি আহমদী কলোনি করার জন্যে জমি দান, অন্যায় বরাদ্দ এবং তথাকথিত গোলা-বারুদ কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তাঁরা অভিযোগ পেশ করেন। উজিরে-আলা কথা দিলেন, তিনি ব্যাপারগুলি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

নিখিল পাকিস্তান মুসলিম সর্বদল সম্মেলন

এর আগেই বলা হয়েছে, ১৯৫২ সালের মে মাসে করাচী জাহাঙ্গীর পার্কে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের বক্তৃতার পর ২রা জুন করাচীতে বিভিন্ন মতাবলম্বী আলেমদের এক সম্মেলন হয়। সেখানে আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে দাবী তৈরী করা হয় এবং একটি বোর্ড গঠন করা হয়। পনেরই আগষ্ট এক সভায় বোর্ড

সিদ্ধান্ত করেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের পনেরো, ষোল এবং সতেরো তারিখে সকল মুসলিম দলের এক সম্মেলন ডাকা হবে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সম্মেলন ডাকার কোনো ব্যবস্থা বোধ হয় গ্রহণ করা হয় নাই। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আলেমের মধ্যে পত্র-বিনিময়ের পর শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসেম্বর আহ্বায়ক মওলানা এহ্‌তিশামুল হক দাওয়াত-নামা প্রচার করেন যে, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসের ষোল, সতেরো এবং আঠারো তারিখে এই সম্মেলন বসবে।

এই সম্মেলনের কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন দলের বিবরণীতে পার্থক্য আছে। মজলিস-ই-আমলের লিখিত বিবৃতি অনুসারে আটাশ জন আলেম এতে যোগদান করেন। তা'র মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিলেন: হজরত পীর শর্ষিণা শরীফ, মওলানা রাগীব আহ্‌সান, মওলানা আজিজুর রহমান, মওলানা আতাহার আলি এবং মওলানা সাখাওয়াতুল আম্‌বিয়া।

১৮ই জানুয়ারী সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো পাশ করা হয়:

১। উজিরে-আজম খাজা নাজিমুদ্দিনের যা মনোভাব, তাতে মির্জাইদের সম্পর্কে দাবী পূরণের কোনো আশা নেই; অতএব সম্মেলনের মতে 'রাস্ত-ইক্‌দাম' বা প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

২। পাকিস্তান সরকার মির্জাইদের অ-মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করতে নারাজ; অতএব তাদেরকে মিল্লাতে-ইসলামিয়া থেকে আলাদা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর একটি উপায় হচ্ছে মির্জাইদের সম্পূর্ণভাবে 'বয়কট' বা এক-ঘরে করা।

৩। মির্জাই পররাষ্ট্র-উজির চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানের পদত্যাগের দাবী গ্রহণ করা হয়নি; অতএব এই সম্মেলন খাজা নাজিমুদ্দিনের পদত্যাগ দাবী করছে যাতে পাকিস্তানের মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইসলামী ভাবধারা বজায় রাখতে পারে।

সম্মেলনে আরো পাঁচটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে নামজাদা মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্মীয় দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাধারণ-পরিষদ গঠন করা হয়। সাধারণ-পরিষদকে পনেরো জন সদস্যের একটি সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করতে বলা হয়। সংগ্রাম-পরিষদকে দাবী আদায়ের জন্যে একটি কর্মপন্থা প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। শেষ প্রস্তাবে বলা হয় যে, কোনো বাস্তব কার্য-ব্যবস্থা শুরু করার আগে যেন এক সাক্ষাৎকারী দল কেন্দ্রীয় সরকারকে জনসাধারণের চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় এবং দরকার হলে যেন উজির-সভাকে শেষ জবাবের জন্যে আরো কিছু সময় দেওয়া হয়।

যাঁদের নিয়ে সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করা হয়, তাঁরা হচ্ছেন:

১। মওলানা সৈয়দ আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহ্‌মদ কাদ্‌রী;
২। আমির-ই-শরিয়াত সৈয়দ আতাউল্লাহ্‌ শাহ্‌ বোখারী;
৩। মওলানা আবুল আলা মওদুদি;
৪। মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনি;
৫। হাফিজ কিফায়াত হোসেন;
৬। মওলানা এহ্‌তিশামুল হক থানভি;

৭। শর্ষিনা শরিফের পীর আবু সালেহ্ মোহাম্মদ জাফর ;
৮। মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ কলিকাত্তাভি ;
৯। পীর গোলাম মাজাদ্দিদ সরহদ্দি ;
১০। মওলানা নুরুল হাসান ;
১১। মাষ্টার তাজুদ্দিন আনসারী ;
১২। মওলানা আখ্তার আলি খান ;
১৩। মওলানা ইসমাইল গুজরানওয়ালভি ;
১৪। সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান ; এবং
১৫। হাজী মোহাম্মদ আমিন সরহদ্দি।

এঁদের শেষের সাতজনকে পরে গ্রহণ করা হয়।

সংগ্রাম-পরিষদের নির্বাচিত এক প্রতিনিধিদল ২২শে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে সাক্ষাৎ করেন। খাজা সাহেব দাবীগুলোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন ; কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে, সেগুলো তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না।

আহ্রারদের বিবৃতিও অনুরূপ ধরণের। তবে তাঁরা বল্ছেন যে, প্রতিনিধিদল খাজা নাজিমুদ্দিনের সংগে সাক্ষাৎ করেন ২১শে জানুয়ারী।

জামাত-ই-ইসলামীর বিবরণ অন্যরকম। জামাতের বিবরণ হচ্ছে ঃ

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে মূল নীতি কমিটীর শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ-সমূহ বিবেচনার জন্যে করাচীতে সকল মতাবলম্বী তেত্রিশ জন আলেমের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর পরই খতম-ই-নবুয়াত আন্দোলনের পরিস্থিতি বিবেচনার উদ্দেশ্যে এক সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এ-সম্মেলনে জামাতের প্রেসিডেন্ট মওলানা আবুল আলা মওদুদিও অংশগ্রহণ করেন এবং বিষয়-কমিটিতে প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু আলেমগণ শাসনতান্ত্রিক সুপারিশের সংশোধনী প্রস্তাব-সমূহের মধ্যে কাদিয়ানি সমস্যাও সামিল করেছেন, সুতরাং আলাদা ক'রে সে-ব্যাপারে এখন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। সুদীর্ঘ আলোচনার পর তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সভাপতির একটি রুলিং-এর দরুণ প্রকাশ্য অধিবেশনে এটা উত্থাপন করা গেল না। এই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়ে মওলানা প্রস্তাব করলেন যে, একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম-পরিষদ গঠন করা হোক এবং একে আইন-সংগত উপায়ে কাদিয়ানী-সমস্যা সমাধানের পন্থা বের করার পূর্ণ ভার দেওয়া হোক—অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ-ব্যাপারে মাথা গলাতে দেওয়া হবে না। এবারও দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-প্রস্তাব কাজে এলো না। কারণ, সংগ্রাম-পরিষদের সব সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং জামাতের মতে, ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সম্মেলনের সদস্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের যা কিছু কার্যকলাপ সবই গঠনতান্ত্রিক অনুমোদন-হীন, অতএব বিধি-বহির্ভূত। ২২শে জানুয়ারী যে প্রতিনিধিদল উজিরে-আজমকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার চরম পত্র দেন, অনুরূপভাবে তাদেরও কোনো বিধি-বহ অধিকার ছিল না। অন্ততঃ তাঁরা সম্মেলনের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেননি। উজিরে-আজমকে তাঁরা যে এক-মাসের নোটিশ দেন, তারও কোনো বিধিসংগত অনুমোদন ছিল না। জামাত মওলানা আবুল আলা মওদুদির মাধ্যমে এই সব বিধি-বহির্ভূত ব্যবস্থাদির জোর সমালোচনা করে এবং এ-সব বন্ধ করার দাবী জানায়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী জামাতের সেক্রেটারী নির্দেশ জারী করেন যে, পাঞ্জাবের মজলিস-ই-আমল প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক ভর্তির যে

ফরম প্রচার করছে, জামাতের কোনো সদস্যই যেন তাতে দস্তখত না করে। তিনি আরো জানান যে, কেন্দ্রীয় মজলিস-ই-আমল কোনো কর্মপন্থা অনুমোদন না করা পর্যন্ত জামাতের কোনো সদস্য যেন তাতে অংশ গ্রহণ না করে। এ-নির্দেশ অমান্য করার জন্যে দু'জন সদস্যকে জামাত থেকে বের ক'রেও দে'য়া হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় মজলিস-ই-আমলের পয়লা বৈঠক হয়। মওলানা মওদুদি তাঁর একজন প্রতিনিধি মারফৎ বৈঠককে জানান যে, যেহেতু প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা বিধি-বহির্ভূত ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সুতরাং এতদ্‌সংক্রান্ত সকল কার্য-কলাপ বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত এবং শুধু কেন্দ্রীয় মজলিস-ই-আমলের আদেশ গ্রহণ করা উচিত। ভাগ্যের এমনই হের-ফের যে, যুক্তির কথা শোনা তো দূরের কথা, কেন্দ্রীয় মজলিসই ভেংগে দেওয়া হলো এবং তা'র বদলে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটি পরের দিনই প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থা শুরু করে। জামাত-ই-ইসলামী এই কমিটি বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থা কমিটির সদস্য ছিল না। এর কোনো সদস্যকেও প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থার কর্মী হিসেবে যোগ দিতে অনুমতি দে'য়া হয় নি। মওলানা তাঁর নির্দেশাবলী এবং কার্যকলাপ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করলেন যে, জামাত এ-ধরণের কার্যকলাপের সংশ্রব থেকে বাইরে।

প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত

২৬শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিস-ই-আমলের যে বৈঠকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে দশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবুল হাসানাত। বৈঠকে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যেহেতু সরকারকে প্রদত্ত চরম-পত্রের মেয়াদ শেষ হয়েও চারদিন গত হয়ে গেছে, সুতরাং এখন শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ঃ দাবী-লিখিত ঝাণ্ডা নিয়ে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক ছোট রাস্তা দিয়ে ঘুরে উজিরে-আজমের বাসভবনে যাবে। যদি শান্ত্রীরা তাদের রুখে, তবে বলবে যে, তা'রা উজিরে-আজমের কাছে দাবী পেশ করতে এসেছে এবং উজিরে-আজম যদি সেগুলো মেনে নে'য়ার ঘোষণা করেন, তবেই তা'রা ফিরে যাবে। এদের যদি গ্রেফতার করা হয়, সংগ্রাম-পরিষদ পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের আরেকটি দল পাঠাবে এবং দাবী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবে চল্‌তে থাকবে। উজিরে-আজম বাঙালী ব'লে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হচ্ছে—এই ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয়, তার জন্য গভর্ণর-জেনারেলের বাসভবনের সম্মুখেও অনুরূপ স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠাতে হবে। মওলানা সৈয়দ আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহ্‌মদকে এই পবিত্র আন্দোলনের হুকুমদাতা নিয়োগ করা হলো। নিজে গ্রেফতার হলে, তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করার ক্ষমতাও তাঁকে দে'য়া হলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে সংগ্রাম-পরিষদের সদস্যদের গ্রেফ্‌তার করা হয়। টেলিফোন-যোগে করাচী থেকে নেতৃস্থানীয় আলেমদের নির্দেশ পেয়ে এর আগেই লাহোর থেকে কয়েক দল স্বেচ্ছাসেবক করাচী রওয়ানা হয়। পাঞ্জাব পুলিশ একদলকে বাধা দিয়ে মাঝপথে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়। আর দু'টি দলকে করাচী পৌঁছলে গ্রেফ্‌তার করা হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী দিনগত রাত্রে করাচীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঞ্জাব সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের তৈরী তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের সবাইকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। এই গ্রেফতারের ফলে সারা পাঞ্জাব—বিশেষ ক'রে লাহোরে এবং শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, রাওয়ালপিণ্ডি, লায়ালপুর এবং মণ্টগোমারী জেলার শহর-সমূহে বিক্ষোভ ও বিশৃংখলার ঢেউ বয়ে যায়। লাহোরে এই ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা এতই বল্‌গাহীন হয়ে পড়ে যে, ৬ই মার্চ সৈন্য-বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং শহরে সামরিক আইন জারী করতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সামরিক আইন জারির কারণ

সকল দলই স্বীকার করেছেন, ৬ই মার্চ তারিখে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তাতে সৈন্য-বাহিনীর হাতে ক্ষমতা দে'য়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব বেসামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের। কিন্তু ৬ই মার্চ তারিখের সকাল বেলা থেকে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তা'র মোকাবিলা করার মতো দৃঢ়সংকল্প এবং সামর্থ্য দুই-ই তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হয়ে গিয়েছিল। বেআইনী কার্য-কলাপ বন্ধ ক'রে বা দোষীদের গ্রেফতার ক'রে আইন বলবৎ করার দায়িত্ব নে'য়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ কারুরই ছিল না। জনসাধারণ যারা এমনিতে ধীর এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তারাই এখন বেয়াড়া উচ্ছৃংখলতায় মাতাল হয়ে উঠলো। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আইন অমান্য করা এবং শাসন-কর্তৃপক্ষকে নতজানু করা। সমাজের নীচু স্তরের যারা, তা'রা বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে পশুর মতো ব্যবহার করতে শুরু করলো—হত্যা, লুণ্ঠন, মূল্যবান সম্পত্তি জ্বালিয়ে ধ্বংস করা ইত্যাদি একাধারে চল্‌লো। কেউ করছে কৌতুকে, কেউ করছে পুরোনো শত্রুর দাদ নে'য়ার জন্যে। সমাজকে যে শাসন-যন্ত্র বাঁচিয়ে রাখে, ভেঙে তা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং উন্মত্ত এই জন-সমুদ্রের হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্যে এবং অসহায় নাগরিকদের জান-মাল রক্ষার জন্যে সাংঘাতিক রকমের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না ক'রে উপায় ছিল না। অতএব দেখা যাচ্ছে: সামরিক আইন জারী করার সরাসরি কারণ ছিল এই-সব গোলযোগ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: এই গোলযোগ কি ক'রে সম্ভব হলো? হঠাৎ ক'রে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যেই হলো—না কোনো কোনো দল বা ব্যক্তি এর জন্যে বহুদিন আগে থেকে জেনে-শুনে পরিকল্পনা করছিলেন? এখানেও সবাই স্বীকার করছেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে করাচীতে এবং সে-দিন রাত্রে ও তার পরে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে সংগ্রাম-পরিষদের কোনো কোনো সদস্যকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে পাঞ্জাবের শহরগুলোতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়, তারই ফল হচ্ছে এই গোলযোগ। মাসাধিককাল আগে উজিরে আজমকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার যে হুমকি দেওয়া হয়, ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সকাল থেকে উজিরে আজম ও গভর্ণর-জেনারেলের বাস-ভবনে স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠিয়ে সেই হুমকি কার্যকরী করা হবে—এই কারণেই গ্রেফতারগুলো করা হয়। অনেকে বল্‌ছেন, নেহাত শান্তিপূর্ণভাবেই এরা এদের গন্তব্য-স্থানে যেতো। এদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র 'সত্যাগ্রহ' করা এবং দলের সংখ্যাও ছিল মাত্র পাঁচ জন। কিন্তু এ-ধরণের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে, তা যাদের জানা আছে তা'রা এ-প্রত্যাশাকে

সখের আশা কাঁচা যুক্তি ব'লে সংগে সংগে উড়িয়ে দেবেন। যদি কাউকে গ্রেফতার করা না হতো, তা-হলে করাচীতে এবং অন্যান্য জায়গায় ঘটনার স্রোত কি ভাবে বইতো বা আন্দোলন কি রূপ গ্রহণ করতো, সেটা শুধুমাত্র কল্পনা বা খেয়ালের বস্তু নয়—রাশ-ছাড়া জনতার ব্যবহার এবং তেমন ক্ষেত্রে শাসন-সম্পর্কীয় অসুবিধার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আগে থেকে বুদ্ধি ক'রে হিসেব করার বস্তু। সুতরাং ২৭শে তারিখে সকালে কাউকে গ্রেফতার করা না হলেও গোলযোগ নিশ্চয়ই ঘটতো। শুধু এই পার্থক্য হতো যে, করাচীতে এবং পাঞ্জাবের বড় বড় শহরে যেখানে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী এবং প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থা কমিটি গঠন এবং ডিক্‌টেটর বা হুকুমদাতা নিয়োগের আয়োজন বহু দিন আগে থেকেই করা হয়েছিল সেখানে গ্রেফতারের প্রয়োজন হতো কিছুটা পরে। দায়িত্বের প্রশ্ন বিবেচনার সময় দেখা যাবে, যে-সব দল প্রত্যক্ষ-কর্মপন্থার বুদ্ধি বের করে এবং তা'র পরিকল্পনা করে তা'রা জানতো এর ফলাফল কি হতে পারে। সংগ্রাম-পরিষদের প্রতিটি সদস্য খুব ভালো করেই জানতেন, অবশ্য যদি বোকা না হন, যে, তা'রা যে কাণ্ড করতে যাচ্ছেন তা'র ফলাফল জনসাধারণের জান-মালের পক্ষে এবং এমন কি শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক। বস্তুতঃ উজিরে-আজমকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাতে দাবী গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে তাঁকে গদী ছাড়তে বলা হয়েছিল এবং দাবী গ্রহণের ব্যাপারে তিনি যদি তাঁর অনমনীয় মনোভাব না বদলান তবেই প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে ব'লে হুমকি দে'য়া হয়েছিল। এই হুমকির প্রচ্ছন্ন অর্থ ছিল যে, উজিরে আজম যদি পদত্যাগ না করেন, তবে তাঁকে সরিয়ে এমন একজন লোককে সরকারী কর্ণধার করা হবে যিনি দাবীগুলো মানতে রাজি হবেন। অতএব এই দাবী-গুলোকেই সব গোলযোগের প্রত্যক্ষ কারণ ব'লে বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং দাবীগুলো কি, কি তা'র রূপ এবং কেনই বা তা'র উদ্ভব হলো, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

দাবী ছিল তিনটে। প্রথম দাবীতে সরকারকে বলা হয় আহ্‌মদিদের কাদিয়ানী ভাগকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করতে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দাবীতে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকে পররাষ্ট্র উজিরের পদ থেকে এবং অন্যান্য আহ্‌মদিদের রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদ থেকে সরিয়ে দিতে বলা হয়। সব দলই কমিশনের কাছে স্বীকার করেছেন যে, তিনটি দাবীরই রূপ মূলতঃ ধর্মীয়—রাজনৈতিক নয়। শুধু একজন লোক এটা স্বীকার করেন নি, তিনি হচ্ছেন শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা হাফিজ কিফায়াত হোসেন। তাঁর মতে, আহ্‌মদিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ঘোষণার দাবীটিই কেবল ধর্মীয়, অন্য দু'টির রূপ রাজনৈতিক। দাবীগুলির রূপ মূলতঃ যে ধর্মীয় সেটা জামাত-ই-ইসলামী বা এর নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদি কেউই অস্বীকার করেননি। অন্য সব আলেমই জোর দিয়ে বলেছেন যে, দাবীগুলোর প্রত্যেকটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক একটিও নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার সংগে জড়িত ছিল এমন কারুর পক্ষেই দাবীগুলির রাজনৈতিক রূপ স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। কারণ, তা হলেই তিনি গোলযোগের ব্যাপারে সরাসরি দায়ী হয়ে পড়েন। সুতরাং কোনো দুনিয়াদারীর কারণে গোলযোগে দায়ী হওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রত্যেককেই জোর ক'রে বলতে হয়েছে যে, দাবীগুলি ধর্মীয়। মামলার এই দিকটায় আহ্‌রার এবং জামাত-ই-ইসলামীর মতো প্রধান দলগুলি এবং কোনো কোনো আলেম যাঁরা আগে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশ্বাস করতেন এবং ভারত-বিভাগ ও মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছেন। তাঁদের আগেকার বাক্যালাপের সংগে এই ধর্ম-উদ্ভূত দাবী-দাওয়া খাপ খাওয়ানো মুশকিল; কারণ ধর্ম-ভিত্তিক মতবাদ ত' আর স্থান-কাল-ভেদে আলাদা হতে পারে না। এই অদ্ভুত

পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকায় তাঁরা জনসাধারণকে যা' বলেছেন, কমিশনের সামনেও তাই বল্‌লেন—দাবীগুলি তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত।

দাবীগুলি সম্পর্কে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-গুলি নাকি সকল মুসলিম সম্প্রদায়েরই দ্ব্যর্থহীন দাবী—করাচীর নিখিল পাকিস্তান সর্ব দলীয় মুসলিম সম্মেলনে এবং লাহোরের সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে যাঁরা প্রস্তাব পাশ করেছিলেন শুধুমাত্র তাঁদের দাবী নয়। প্রত্যেকটি দল যে আলাদা ভাবে নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই বিষয়গুলি আলোচনা ক'রে প্রস্তাব পাশ করেছিল, সে-কথা অবশ্য কেউ বল্‌ছেন না। আসলে ব্যাপারটি এই হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি ধর্মীয় দল থেকে দু-একজন সদস্যকে বাছাই ক'রে সম্মেলনে প্রতিনিধি ক'রে পাঠানো হয়। দাবীগুলি সব ধর্মীয় দলের ঐক্যবদ্ধ দাবী—এ-কথার মধ্যে সত্য শুধু এইটুকু যে, দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় দলগুলি থেকে দু-একজন সদস্য দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানান। সুতরাং কেবল এই অর্থে দাবীগুলিকে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দাবী ব'লে গণ্য করা যেতে পারে।

কমিশন যে-সব আলেমদের এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই বলেছেন যে, ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ গণ-পরিষদ যে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করেন এবং সেই ধর্মীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থা—যাকে ইসলাম বলা হয়—এই দাবীগুলি তারই স্বভাব-প্রসূত। তাঁরা অত্যন্ত জোরের সংগে বলেছেন যে, পাকিস্তান এই জন্যই দাবী করা হয় এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়—যাতে নতুন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোরাণ এবং সুন্নার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে তোলা হবে। এই দাবী কামিয়াব হওয়ায় এবং আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তি স্বীকৃত হওয়ায় দেশের আলেমদের এবং জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, সে-টা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শুধু মেনেই নেবেন না, সর্বান্তঃকরণে সমর্থনও করবেন। এই বিশ্বাসের আরও কারণ হচ্ছে, গত কয়েক বছর যাবৎ এই নেতারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে বেড়িয়েছেন যে, তাঁরা পাকিস্তানকে এমন একটি ইসলামী রাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলবেন, যার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইসলামী অনুশাসন। এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো কোনো নেতা নাকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, এই আদর্শ হাসিলই তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁদের দাবীগুলো আদায়ের জন্যে আলেমদের কেবলমাত্র প্রয়োজন ছিল ধর্মীয় যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যে, আহ্‌মদিরা ইসলামের গণ্ডীর বাইরে একটি আলাদা সম্প্রদায়,—অতএব ইসলামী অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রের কোনো কার্যকলাপে তা'রা শরীক হতে পারে না। দাবীগুলির রূপ ভালো ক'রে বুঝতে হলে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামকে যখন ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিধান বলে' দাবী করা হয়, তখন এই অর্থে করা হয় যে, এর একটি সাংস্কৃতিক বা তামদ্দুনিক দিক আছে, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রাজনৈতিক, আইনগত ও সামাজিক কাঠামো। নিছক ধর্মীয় অনুশাসন, নীতিগত বিধি-নিষেধ এবং পরিবার-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাদি থেকে এ-গুলো আলাদা। ইসলাম সম্পর্কে এই মত কিছুটা ইউরোপীয় সংজ্ঞা-শব্দ থেকে ধার করা। তবে 'দারুল-ইসলাম' মতবাদের উপরও এর ভিত্তি আছে। দারুল ইসলাম এমন একটি দেশ, যার সব-কিছু কার্যকলাপ কোরাণের অন্তর্ভুক্ত অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হবে। আহ্‌মদিদের সম্পর্কীয় দাবীগুলিকেও বলা হয় যে, তা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন দেখা যাক্, কি ক'রে বলা হয় যে, দাবীগুলি ধর্ম থেকে আস্‌ছে। এর জন্যে মুসলমানদের সংগে আহ্‌মদিদের মতবাদের কোথায় কি পার্থক্য এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক বিধি—ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র—দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়, সেটা বিচার করা দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলমান ও আহমদীদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ

খতম্-ই-নবুয়াত

পয়লা মতভেদ হচ্ছে মির্জা গোলাম আহ্মদের স্থান নিয়ে। মির্জা গোলাম আহ্মদ নিজেকে নবী ব'লে দাবী করেন। এর ফলে মুসলমানদের মতে তিনি ইসলামের বাইরে চলে যান। একটি ছহী হাদীস অনুযায়ী, খোদা মানুষের হেদায়েতের জন্যে মোট এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন। মুসলমানদের বিশ্বাস: ইসলামের নবীই হচ্ছেন এই পয়গাম্বরদের শেষ। কোরাণ এবং বাইবেলে এ দের কারো কারো নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের নবীর ইন্তিকালের সংগে সংগে নবুয়াতের শেষ এবং এর পর আর কোনো নতুন নবীর আবিভাব হবে না—এই বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে কোরাণের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি:

সুরা ৩৩, আয়াত ৪০ :

"মোহাম্মদ তোমাদের লোকদের কারও পিতা নন, কিন্তু (তিনি) আল্লাহ্র বার্তা-বহনকারী এবং নবীদের মোহর স্বরূপ: এবং আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন।"

সুরা ৩, আয়াত ৮১ :

"দেখ, আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এই বলে: 'আমি তোমাদের একখানি কিতাব এবং জ্ঞান দিচ্ছি; অতঃপর তোমাদের নিকট যা' আছে তা'র যথাথতার সাক্ষ্য দে'য়ার জন্যে একজন বার্তাবহনকারী আসবেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো এবং তাকে সাহায্য করো।' আল্লাহ্ বললেন: 'তোমরা কি স্বীকার করো এবং আমার এই অঙ্গীকারকে তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক বলে গ্রহণ করো?' তা'রা বললো, 'আমরা স্বীকার করি।' তিনি বললেন: 'তা হলে সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সংগে সাক্ষী থাকি।"

সুরা ৫, আয়াত ৪ :

"আজ যারা ঈমান অস্বীকার করে, তা'রা তোমার ধমের সব আশা ত্যাগ করেছে: তবু তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ তোমার জন্যে তোমার ধর্মকে আমি নিখুঁত ক'রে দিলাম, তোমার প্রতি আমার সব অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম এবং তোমার জন্যে ধর্ম বেছে দিলাম ইসলাম।"

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

উল্লিখিত আয়াৎগুলি সম্পর্কে প্রথম যুগ থেকে এ-পর্যন্ত যে-সব নামজাদা টীকাকারের মন্তব্য বেরিয়েছে সে-গুলোর এবং কতকগুলো হাদীসেরও দোহাই দে'য়া হয়। এর সব-গুলিতেই বলা হয় যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। আরবী, ফারসী এবং উর্দু ভাষার নামজাদা কবিদের কোনো কোনো কবিতার এবং এ-সম্পর্কীয় কিছু বই-পুস্তকেরও উল্লেখ করা হয়েছে। অপর পক্ষে, আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ কৌঁসুলী জনাব আবদুর রহমান খাদিম যে-সব দলিলের উপর নির্ভর করেন, তা' হচ্ছেঃ সুরা ৪, আয়াত ৬৯; সুরা ৫৭, আয়াত ১৯; সুরা ৭, আয়াত ৩৫ এবং সুরা ২৩, আয়াত ৫১।

সুরা ৪, আয়াত ৬৯ঃ

"যারা আল্লাহ্‌ এবং রসুলকে মান্য করে তা'রা সেই সমস্ত লোকের সাহচর্যে থাকবে—যাদের উপর আল্লাহ্‌র রহ্‌মত বর্ষিত হয়েছে—পয়গাম্বর (যাঁরা শিক্ষা দেন), যারা (সত্যকে ভালবাসার ব্যাপারে) সৎ, সাক্ষী (যারা সাক্ষ্য দেয়) এবং যারা সৎকর্ম করেঃ আহা কি সুন্দর সাহচর্য।"

সুরা ৫৭, আয়াত ১৯ঃ

"যারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলদের বিশ্বাস করে—তারাই আল্লাহ্‌র কাছে (সত্যকে ভালবাসার ব্যাপারে) সৎ, এবং সাক্ষী (যারা সাক্ষ্য দেয়)ঃ তা'রা তাদের পুরস্কার এবং তাদের আলো পাবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌কে এবং আমাদের ইংগিত-সমূহকে অস্বীকার করে, তা'রা দোজখের আগুনে বাস করবে।"

সুরা ৭, আয়াত ৩৫ঃ

"হে আদমের সন্তানগণ! যখনই তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর এসে তোমাদের প্রতি আমার ইংগিত-সমূহের পুনরুল্লেখ করেন—যারা সৎ এবং (জীবনকে) সঠিক পথে রাখে—তাদের কোনো ভয় নেই, তা'রা অনুশোচনা করবে না।"

সুরা ২৩, আয়াত ৫১ঃ

"হে পয়গাম্বরগণ! ভালো এবং পবিত্র (সব) জিনিষই ভোগ করো এবং সৎ কাজ করোঃ কেননা তোমরা যা' কিছু কর (সবই) আমি অবগত আছি।"

বিশেষ এক যুক্তি-প্রকরণ দ্বারা উল্লিখিত আয়াতগুলি থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আমাদের রসুলের পরেও ভবিষ্যতে এমন লোকের আবির্ভাব হবে যাঁদের নবী বা রসুল বলা যেতে পারে। এই যুক্তিকে জোরদার করার জন্যে কিছু হাদিস এবং নামজাদা ধর্মীয় ভাষ্যকারদের কোনো কোনো গ্রন্থেরও উল্লেখ করা হয়েছে। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ নিজেকে নবী বলেছেন, সে-কথা অস্বীকার করা হয় না; তবে বলা হয় যে, তিনি কোনো বিশেষ অর্থে নবী কথাটি ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত অর্থে তিনি নবী নন অর্থাৎ পুরাণো কোনো বার্তাকে রদ ক'রে, পরিবর্তন ক'রে বা পূরণ ক'রে খোদার কাছ থেকে যেমন অন্য নবীরা বার্তা বহন ক'রে এনেছেন, তেমন কোনো বার্তা তিনি আনেন নি। নবুয়াতের প্রতি তাঁর যে দাবী, সেটা 'তাশরি-ই' নবুয়াত নয়, 'জিল্লি' বা 'বুরুজি' নবুয়াত। অপর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইসলামী মতবাদে বুরুজ বা জিল্লের কোনো স্থান নেই। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নবুয়াতের

অহি লাভ করেছে বলে দাবী করে, তবে সে নতুন এক উন্নত গড়ে তোলে এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। মির্জা গোলাম আহমদ, আহ্‌মদিয়া জামাতের বর্তমান নেতা এবং এই জামাতের প্রতিনিধিত্বশীল লেখকদের বিভিন্ন লেখার উল্লেখ ক'রে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, নবীদের জন্যে খোদা যে ধরণের অহি নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন, সে-রকমের অহি লাভ করেছেন বলে মির্জা গোলাম আহমদ দাবী করেছেন। সুতরাং অল্পের ভেতরে প্রশ্নটি হচ্ছে: মির্জা গোলাম আহ্‌মদ নবুয়াতের অহি লাভ করেছেন ব'লে কখনও দাবী করেছেন কি না। আগের দিনে যখনই কোনো নবীর আবির্ভাব হয়েছে, তিনি তাঁর লোকদের উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন—সেটা হচ্ছে নতুন নবুয়াতের দাবীর যথার্থতা পরীক্ষা ক'রে তা বিশ্বাস করা। তাঁর নবুয়াতের প্রতি কোনো প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ করলেই পরকালে শাস্তির ভয় থাকে। সাধারণ লোকদের এ-ক্ষেত্রে করণীয় পথ থাকে মাত্র দু'টি—গ্রহণ করা—নতুবা অস্বীকার করা। গ্রহণ করলে একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। নতুন সম্প্রদায় পুরোণো সম্প্রদায়কে মনে করে পাতের বাইরে; পরণোরা মনে করে নতুনেরা দল-ছাড়া। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ লোকদেরকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর দাবী পেশ করলেও এটা দেখতে হবে, যে নবুয়াতের অহি অমান্য করলে পরকালে শাস্তি হয়, সে-ধরণের কোনো অহির দাবী তিনি করেছেন কি না। আহ্‌মদিরা এবং তাদের বর্তমান নেতা অনেক বিচার-বিবেচনা ক'রে কমিশনের সম্মুখে বলেছেন যে, না, তিনি সে-ধরণের কোনো দাবী করেন নি। কিন্তু বিরোধী পক্ষ বল্‌ছে যে, হাঁ, তিনি করেছিলেন। স্বয়ং মির্জা গোলাম আহ্‌মদ এবং জামাতের বর্তমান নেতার লেখা থেকে এমন-সব আভাস পাওয়া যায়, যা' নাকি বিরোধী দলের মত সমর্থন করে। কমিশনকে আহ্‌মদিদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে যে, মির্জা গোলাম আহ্‌মদ নিজেকে নবী বলেছিলেন কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাঁর কোনো একটি 'ইল্‌হামে' তিনি খোদা-কর্তৃক নবী ব'লে বর্ণিত হয়েছিলেন। তিনি নতুন কোনো বিধি আনেন নি বা পুরোণো কোনো বিধি রদ বা পূরণ করেন নি—এবং মির্জা সাহেবের অহিতে বিশ্বাস না করলে কেউ ইসলামের গণ্ডীর বাইরেও চলে যাবে না।

যিশু খৃষ্ট

উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় মতভেদ হচ্ছে: যিশু খৃষ্টকে ক্রুশ-বিদ্ধ ক'রে হত্যা করা এবং কেয়ামতের পূর্বে তাঁর পুনরায় আবির্ভাব হবে ব'লে যে বিশ্বাস রয়েছে, সে-সম্পর্কে। কম ক'রে এ-ব্যাপারে চার রকমের মত আছে:

(১) অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মতে যিশু ক্রুশে মারা যান নি, চতুর্থ আসমানে জীবিত আছেন। সেখান থেকে তিনি কেয়ামতের আগে অবতরণ করবেন। তাঁর অবতরণ আসন্ন কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

(২) আহ্‌মদিদের মতে, যিশুকে শিষ্যেরা ক্রুশ থেকে বাঁচায় এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে আরোগ্য করে। এর পরে তিনি কাশ্মীরে চলে আসেন এবং স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেন। কেয়ামতের পূর্বে যাঁর আবির্ভাবের কথা, তিনি আসলে যিশুর রূপ এবং গুণাবলী লাভ করবেন এবং সে-ব্যক্তিই হচ্ছেন মির্জা গোলাম আহ্‌মদ।

(৩) ক্রুশেই যিশু মারা যান; তবে কেয়ামতের পূর্বে তিনি কবর থেকে আবার উঠবেন। এবং

(৪) ক্রুশেই যিশু মারা যান, এবং তিনি আর কখনও আবির্ভূত হবেন না—না নশ্বর দেহ নিয়ে, না রূপক ভাবে।

এই ঘটনা সম্পর্কে কোরাণে যে-সব আয়াত আছে, অ-আহ্‌মদিরা তা'র ব্যাখ্যা ক'রে প্রমাণ করতে চায় যে, যিশু ক্রুশে মারা যাননি, চোখের একটা ধাঁ-ধাঁ সৃষ্টি ক'রে খোদা তাঁকে চতুর্থ আসমানে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি কেয়ামতের পূর্বে অবতরণ করবেন। এই মতের সপক্ষে কিছু হাদিসেরও উল্লেখ করা হয়েছে। আহ্‌মদিরা এইসব আয়াতের দ্বারাই প্রমাণ করতে চায় যে, ক্রুশের বাইরে যিশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। যিশুর গুণাবলী নিয়ে অন্য এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন এবং তিনি হচ্ছেন মির্জা গোলাম আহ্‌মদ। কতিপয় খ্যাতনামা ধর্মবিদের মতামতও তাঁরা এ-ব্যাপারে উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছেন যে, কেয়ামতের পূর্বে যিনি পুনরায় আবির্ভূত হবেন, তিনি যিশুর গুণাবলী সমন্বিত হবেন—যিশু নিজে আবির্ভূত হবেন না। মজলিস-ই-আমলের তরফ থেকে মওলানা মুর্তজা আহ্‌মদ খান মাইকাশ বলেছেন যে, কোরাণের এই সব এবং অন্যান্য আয়াতের যে-ব্যাখ্যা আহ্‌মদিরা করে, তাতে তাদের প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত।

জিহাদ

দুই দলের মধ্যকার তৃতীয় মতভেদ হচ্ছে জিহাদের ব্যাখ্যা নিয়ে। এ-বিষয়ে কোরাণে যে সব জায়গায় উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে: সুরা ২২, আয়াত ৩৯ ও ৪০; সুরা ২, আয়াত ১৯০ থেকে ১৯৪; সুরা ৬০, আয়াত ৮; সুরা ৪, আয়াত ৭৪ ও ৭৫; সুরা ৯, আয়াত ৫; সুরা ২৫, আয়াত ৫২।

জিহাদ সম্পর্কে আহমদিদের মত এই যে, 'অস্ত্রের যুদ্ধ' কেবল আত্মরক্ষার বেলায় প্রযোজ্য। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ এ-বিষয়ে তাঁর যে-সব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার দ্বারা তিনি কোরাণের কোনো আদেশ বা নির্দেশের রদ-বদল করতে চাননি বরং কোরাণের বাণীর উপর ভিত্তি ক'রেই তিনি কেবল একটা দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য অপর পক্ষের কথা হচ্ছে, মির্জা সাহেব তাঁর বক্তব্যের দ্বারা কোরাণের চলতি আদেশ রদ করার চেষ্টা করেছেন। প্রমাণ হিসেবে মির্জা সাহেবের নিজের লেখা এবং তাঁর খলিফাদের লেখা থেকে যে-সব উদ্ধৃতি করা হয়, তার দু'চারটি হচ্ছে এরূপ:

"আমি তোমাদের জন্যে একটি আদেশ এনেছি; এটি হচ্ছে: এখন থেকে তরবারির দ্বারা জিহাদ নিষিদ্ধ করা হলো।"

"এখন থেকে ধর্মের জন্যে জিহাদ করা হারাম।"

"ধর্মের জন্যে সব হানাহানি এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

"মেহ্‌দির আগমনের একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি এসে ধর্মের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ ক'রে দেবেন।"

"আমি জিহাদের বিরুদ্ধে শত শত বই লিখে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আরব, মিসর, সিরিয়া এবং আফঘানিস্তানে ছাপিয়ে প্রচার করেছি।"

"যে-ব্যক্তি নিজেকে গাজী ব'লে দাবী করে তরবারীর দ্বারা কাফেরদের হত্যা করে, সে খোদা এবং তাঁর রসুলের খেলাফ করে।"

"আমার সম্প্রদায়ের পক্ষে তরবারীর জিহাদ একেবারেই নিষিদ্ধ। খোদা আমাকে এই সম্প্রদায়ের ইমাম এবং পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেছেন। আমার সম্প্রদায় ধর্মের নামে যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করে।"

"আমার মতে, জিহাদের মতবাদ ইসলামের যে-প্রকার মর্যাদা-হানি করে, অন্য কোনো মতবাদ তা' করে না।"

এই সব উদ্ধৃতির দ্বারা আহ্‌মদী-বিরোধী দল জোরে-শোরে প্রমাণ করতে চায় যে, এর ফলে কোরাণের অনুশাসনের রদ-বদল করা হয়েছে। আহ্‌মদিরা বলছে, মির্জা সাহেবের কথা-বার্তার দ্বারা কোরাণের আদেশের কোনো রদ-বদল করা হয়নি বা কোনো নয়া মতবাদ সৃষ্টি করা হয়নি ; বরং শতাব্দীর ভুল বুঝাবুঝি থেকে উদ্ধার ক'রে কোরাণের মূল অনুশাসনের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়েছে। অ-আহ্‌মদিরা প্রমাণ করতে চায় যে, এ-সব থেকে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, মির্জা সাহেব নিজেকে শরিয়াত-ধারী নবী ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

আহ্‌মদিদের সম্পর্কীয় মত-বিরোধের বীজ গত অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। খতম-ই-নবুয়াত, কেয়ামতের পূর্বে ইসা (আঃ) নবীর সশরীরে আবির্ভাব এবং জিহাদ সম্পর্কীয় মতভেদের ফলে আলেমরা মির্জা সাহেবকে ভণ্ড ব'লে খেতাব দিতে শুরু করেন। ১৮৮২ সালে মির্জা সাহেব খোদার কাছ থেকে অহি লাভ করেছেন ব'লে ঘোষণা করলে তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরের ফত্‌ওয়া বেরুতে থাকে। একদিকে এই নতুন মতবাদ বেশ কিছু জ্ঞানী এবং প্রভাবশালী লোককে আকর্ষণ করলো,—যেমন মওলানা মোহাম্মদ আলী, খাজা কামালউদ্দিন, ডাঃ মির্জা ইয়াকুব বেগ এবং ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন। অন্যদিকে বহু লোককে ক্ষেপিয়ে তুললো, যাঁরা মনে করলেন এই মতবাদের মূল হচ্ছে রাজনৈতিক এবং মুসলিম সমাজ ও দেশ-সমূহের পক্ষে বিপজ্জনক। ডাঃ মোহাম্মদ ইকবাল খুব কড়া ভাষায় এর নিন্দা করেন। অধ্যাপক ইলিয়াস বার্নী একে হাস্যাস্পদ ব'লে উড়িয়ে দেন। আরো অনেকে এর বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। আহ্‌মদিরা প্রচারের মূল্য বোঝে ; তাই তাদের প্রচার ব্যবস্থা প্রথম থেকেই আঁটসাট। ফল হয়েছে এই যে, উভয় পক্ষ থেকেই অগুণ্‌তি প্রচার-পুস্তকের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য অভিযোগ ও দোষারোপ

ইসলামের সব ধর্মীয় মত-বিরোধে কতকগুলো মার্কা-মারা গালি-গালাজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন : মুল্‌হিদ, মুরতাদ, কাফের, জিন্দিক, মোশ্‌রেক, মোনাফেক, ফাসিক, ফাজির, মুফ্‌তারি, মালাউন, কাজ্জাব, শয়তান, ইবলিস, মরদুদ, শাকি। বর্তমান বিরোধ সম্পর্কীয় বই-পুস্তকেও এ-সব শব্দের ব্যবহার চলতে থাকে। উভয় পক্ষ থেকে আরো কিছু গালি-গালাজ যোগ করা হলো,—যেমন : জিনার পয়দা, হারামজাদা, শুকর, খান্‌কি, বেশ্যা, কুত্তি, মদখোর, মাগিবাজ, ভণ্ড, গুণ্ডা, বেহায়া এবং আরো অনেক যা' রুচির বাইরে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিরোধ সম্পর্কে যা' কিছু হয়েছে, তাকে পরস্পরের প্রতি রুচি-বিগর্হিত একটানা গালি-গালাজ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। প্রায় ক্ষেত্রেই এই সব গালি-গালাজ দ্বারা ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং এ-ব্যাপারে আহ্‌রারদের কেউ টেক্কা মারতে পারেনি।

এ-ধরণের দলাদলি ইংরেজদের বেশ পছন্দসই। প্রজারা ধর্মীয় মতভেদ নিয়ে ব্যস্ত থাক্, এই ছিল তাদের নীতি। অবশ্য আইন ও শৃংখলা ভঙ্গের আশংকা না থাকলেই হলো। কে বেহেশতে যাবে বা কার দোজখে যাওয়া উচিত—কেবল এই নিয়ে যদি লোকেরা নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ করতে থাকে, কিন্তু মাথা ফাটাফাটি না করে বা পৃথিবীর সুখ-সুবিধার দাবী না করে, তা' হলেও ইংরেজের পোয়া-বারো। কিন্তু মাথা ফাটাফাটির বেলা মাফ-মৌরত নেই। ইংরেজরা এ-ধরণের মতভেদের শুধু সুযোগই দেয়নি, উৎসাহও দিয়েছে। বৃটিশ রাজের এই গুণটি খুব ভালো ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মির্জা সাহেব। আহ্‌মদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও এর অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে অ-আহ্‌মদিদের একটি প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে, তারা ইংরেজের নির্লজ্জ ধামাধরা। মির্জা সাহেব জিহাদ সম্পর্কে যে-বই লেখেন, তা' মনে হয়

সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ অফিসারদের হত্যার ব্যাপার খেয়াল ক'রেই লেখা হয়। ভারতে আগমনকারী প্রত্যেক ইংরেজ অফিসারকে উপজাতীয় পাঠান বা আফঘান গাজীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার ক'রে দেওয়া হতো। এরা কাফেরদের হত্যা করাকে ধর্মীয় কর্তব্য এবং অর্থের দিক দিয়ে লাভজনক মনে করতো। কারণ, এর বদলে বেহেশতে পুরস্কার পাওয়া যাবে। ধর্মীয় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এ ধরণের আক্রমণ করা অবশ্য জিহাদ সম্পর্কে ইসলামী মতবাদের বিরোধী। সুতরাং এই বিশ্বাসের বিরোধিতা ক'রে মির্জা সাহেব ভালো কাজই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের ভেতর বৃটিশ রাজ সম্পর্কে গুণগান ও চাতুরীপণা করার জন্যে তাঁর মতবাদ লোকদের সন্দেহের উদ্রেক করে। মুসলমানরা আরো ক্ষেপে যায় এই জন্য যে, মির্জা সাহেব তুলনা ক'রে দেখান যে, ধর্মীয় ব্যাপারে ইংরেজরা উদার, কিন্তু মুসলমান দেশগুলি অনুদার। পয়লা বিশ্ব-যুদ্ধের কালে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্ককে পরাজিত ক'রে ইংরেজ বাগদাদ দখল করলে কাদিয়ানে বিজয়-উৎসব পালন করা হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভের ঝড় ব'য়ে যায়। তা'রা আহ্‌মদী আন্দোলনকে ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক ব'লে বিবেচনা করতে শুরু করে।

আলাদা একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিলে আহ্‌মদিরা ভাবনায় পড়লো। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত আহ্‌মদিদের কিছু কিছু লেখা থেকে ধরা পড়ে যে, তারা আসলে ইংরেজের স্থলাভিষিক্ত হবার আশা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাস্তবে রূপ নেবে বলে' যখন সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন তা'রা বুঝলো এই নতুন রাষ্ট্রের আইডিয়ার সংগে নিজেদের স্থায়ীভাবে খাপ খাওয়ানো মুশকিল। তা'রা নিশ্চয়ই উভয় সংকটে পড়েছিল—একদিকে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' হিন্দু রাষ্ট্র, অন্যদিকে পাকিস্তান—যেখানে ধর্মীয় ব্যাপারে শিথিলতা সহ্য করার কথা নয়। তাদের কোনো কোনো লেখা থেকে বুঝা যায়, তা'রা দেশ-বিভাগের বিরোধী ছিল এবং যদি বিভাগ হয়ও, তবে তারা' তা রদ করার চেষ্টা করবে। কাদিয়ানের ভাগ্য নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণই স্পষ্টতঃ এর পেছনে ছিল। কাদিয়ান সম্পর্কে মির্জা সাহেব বেশ কয়েকটি ভবিষ্যৎ-বাণী করেন। প্রাথমিক বিভাগ বন্দোবস্তে কাদিয়ান পাকিস্তানে পড়ে। কিন্তু এই জেলার (গুরুদাসপুরের) মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা মাত্র এক ভাগ বেশী ছিল এবং তা'রা প্রধানতঃ কাদিয়ান ও আর দু'টি শহরেই জড়ো ছিল। কাদিয়ানের চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিল। কাদিয়ানের ভারত-ভুক্তির দাবী অবশ্য আহ্‌মদিদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং একমাত্র খোলা পথ ছিল পাকিস্তানে রাখার জন্যে চেষ্টা করা। আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে যে, তাদের পীড়াপীড়ির জন্যে এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের যুক্তির জন্যেই সীমানা-কমিশন গুরুদাসপুর জেলা ভারতের ভাগে দেন। কমিশনের সম্মুখে মুসলিম লীগের পক্ষ সমর্থনের জন্যে কায়েদে আজম চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকে মনোনীত করেন। পাঞ্জাব দাঙ্গা-তদন্ত আদালতের সভাপতি বিচারপতি এম. মুনীর সীমানা কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমান রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য নয়; কেননা গুরুদাসপুর জেলাকে পাকিস্তানে আনার জন্যে তিনি সাধ্য-মতো লড়েছিলেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান মুসলিমদের জন্যে যে নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন, তার বদলে তাঁকে মিথ্যা অভিযোগ লাগিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা নির্লজ্জ কৃতঘ্নতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে: মির্জা সাহেব অন্যান্য নবীদের তুলনায় নিজেকে খুব বাড়িয়ে প্রচার করেছেন। আহ্‌মদিদের নিজেদের লোকের নামের সংগে আমিরুল-মোমেনিন, উম্মুল-মোমেনিন, সৈয়দাতুন্নেছা, রাজি আল্লাহো আন্‌হো, সাহাবায়ে কেরাম ইত্যাদি ব্যবহার করার বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে। এই সব নাম রসুলের (দঃ) পরিবারের লোকদের এবং তাঁর সাহাবাদের

সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর জওয়াবে জনাব আবদুর রহমান খাদিম পুরোনো কেতাব-কালাম ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে, কোনো কোনো পীর-দরবেশের পরিবারেও এর প্রায় সবগুলিই ব্যবহার করা হয়েছে। এমন-কি আহ্‌রার নেতা সাহেবজাদা ফয়জুল হাসান এবং চৌধুরী আফজাল বেগের পরিবারেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এই সব নাম ব্যবহার করা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, সে-বিচার না ক'রেও এটা বলা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই ব্যাপারটি আপত্তিজনক ব'লে মনে হবে।

আহ্‌মদী অফিসারগণ কিছু কিছু লোককে নিজেদের দলে ভিড়াতে থাকেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫২ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখের ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হওয়ার পর আহ্‌মদী জামাতের নেতার নির্দেশে তা বন্ধ হয়।

আহ্‌মদিরা একটি মজবুত জোট-বদ্ধ সম্প্রদায়। তাদের সদর দফ্‌তর এমন একটি শহরে অবস্থিত যেখানে কেবল আহ্‌মদিরাই বাস করে। এখানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আছে। এর আবার অনেক-গুলি বিভাগঃ যেমন বৈদেশিক বিষয়ের বিভাগ, আভ্যন্তরীণ বিষয়ের বিভাগ, জনসাধারণ সম্পর্কীয় বিভাগ এবং প্রকাশ ও প্রচার বিভাগ। এ-সব দস্তরমতো একটি সেক্রেটারিয়েটের কায়দায় কাজ করে। খুদ্দাম-ই-দীন নামে তাদের একদল স্বেচ্ছাসেবকও আছে। ফুরকান ব্যাটালিয়ন নামক যে নিছক আহ্‌মদী সৈন্যদলটি কাশ্মীরে ছিল, তাদের নিয়েই এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত। আহ্‌মদীরা অন্যান্য মুসলমানদের সংগে বা পেছনে নামাজ পড়ে না এবং জামাতের বাইরে তাদের মেয়েদের বিয়ে-শাদী দেয় না। অ-আহমদিরা এই সব ব্যাপার উল্লেখ ক'রেই দাবী করেছে যে, আহ্‌মদিদের সংখ্যালঘু ব'লে ঘোষণা করা উচিত। আহ্‌মদিদের যুক্তি হলোঃ বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, নীতি এবং কার্য-পন্থা আছে এমন যে-কোনো সম্প্রদায়েরই ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের বিষয়াদি চালানোর অধিকার রয়েছে। বিয়ে-শাদীর প্রশ্নের জবাব হচ্ছেঃ অ-আহ্‌মদির সংগে আহ্‌মদী মেয়ের বিয়ে নাকচ নয়, তবে মেয়ের স্বার্থের খাতিরে তার মা-বাপকে পরামর্শ দেওয়া হয় যেন জামাতের ভেতর থেকেই জামাই পছন্দ করা হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভেতরও এ-ধরণের প্রথা বিদ্যমান ব'লে নজির উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মুসলমানদের পেছনে নামাজ পড়ার ব্যাপারে তারা বলছেন যে, অনুরূপ বিধি-নিষেধ অন্য মুসলিম দলেও পালন করা হয়ে থাকে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান কায়েদে আজমের জানাজার নামাজে যোগদান করেননি ব'লে সেটা খুব ফলাও ক'রে বলা হয়েছে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খানের জবাব হচ্ছেঃ মওলানা শাব্বির আহ্‌মদ উসমানি জানাজার নামাজে ইমামতি করেন, অথচ ইনিই প্রকাশ্যে আহ্‌মদিদের কাফের এবং ইসলাম-বহির্ভূত ব'লে ফতোয়া দিয়ে বলেছেন যে, এদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু—সুতরাং এই লোকের পেছনে নামাজ পড়তে তাঁর মন যায়নি।

আহ্‌মদিরা মির্জা গোলাম আহ্‌মদের এক ফতোয়া আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁকে অবিশ্বাস করে না এমন মুসলমানদের পেছনে আহ্‌মদিরা জানাজার নামাজ পড়তে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রথায় গিয়েই দাঁড়ায়।

আহ্‌মদিরা অন্য মুসলমানদের কাফের বা ইসলাম-বহির্ভূত মনে করে কি-না সে-প্রশ্নে আহ্‌মদিরা বলছেন যে, না, তা'রা কাফের নয়। আহ্‌মদী বই-পুস্তকে যে কাফের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা 'ইসলাম-বহির্ভূত' বুঝান হয়নি। কমিশন বলছেনঃ আমরা এ-বিষয়ের উপর আহ্‌মদিদের আগেকার বহু মতামত দেখেছি। আমাদের মতে, এ-গুলির এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না যে, যারা মির্জা গোলাম আহ্‌মদে বিশ্বাস করে না, তারা ইসলামের বাইরে।

আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযোগ হচ্ছে যে, তারা নিজেদের মতবাদ চালু করার জন্যে আক্রমণ-মূলক প্রচার-কার্য চালায়। এ-ব্যাপারে করাচী জাহাঙ্গীর পার্কে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানের বক্তৃতা এবং সভা-সমিতিতে আহমদী অফিসারদের প্রকাশ্যভাবে নিজেদের মতবাদ প্রচার ও সরকারী কাজে আগত লোক-দের ধরে' দলে ভর্তি করার প্রথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় আঞ্জুমানগুলির পদ দখল করার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের খুব কড়া সমালোচনাও করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে কোয়েটায় এক বক্তৃতায় মির্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহ্‌মদ তাঁর জামাতের কাছে বালোচিস্তানে প্রচার-কার্য বৃদ্ধির আবেদন জানান, যাতে এই প্রদেশ তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য-কলাপের ঘাটি হতে পারে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাবওয়ায় আহ্‌মদী আন্‌জুমানের বার্ষিক অধিবেশনে এক ভাষণে তিনি তাঁর জামাতের লোকদেরকে অনুরোধ করেন, যেন তারা ধর্মান্তর কার্য খুব জোরে-শোরে চালান যাতে ১৯৫২ সালের শেষ-অবধি সব অবিশ্বাসীরা আহ্‌মদী মতবাদের আঁওতায় আসে। অনুরূপ আরেকটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, তাঁরা শুধু সৈন্য-বাহিনীতে ভিড় না ক'রে যেন সব বিভাগেই ছড়িয়ে পড়েন।

আহ্‌মদিদের প্রচার-কার্য শুধু পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'আল-ফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে দেখা যায়, অন্যান্য দেশে নিযুক্ত আহ্‌মদী প্রচারকদের কার্যকলাপের ফলে মাঝে মাঝে মার-পিট এবং গোলযোগ হয়েছে।

আহ্‌মদিদের এই ধরণের আক্রমণাত্মক প্রচার-কার্যের ফলে নাকি মুসলমানদের মনে আঘাত লেগেছে এবং সে-জন্যেই তারা আহ্‌মদিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ব'লে ঘোষণা করার দাবী করেছে। এই যুক্তি প্রসংগে আহ্‌মদী নেতাদের আরো কিছু লেখার নজির দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে মুসলমানদের হয় 'দুশমন' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে, না হয় আহ্‌মদিদের থেকে আলাদা ক'রে দেখানোর জন্যে 'মুসলমান' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

দাবীর পেছনে মতবাদ

এবারে দেখা যাক্, আহ্‌মদিদের বিরুদ্ধে যে তিনটি দাবী পেশ করা হয়েছিল, তার ভিত্তি কোথায়। আলেমদের প্রায় সবাই বলেছেন, প্রত্যেকটি দাবীর গোড়ায় রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে তাদের মত-বিশ্বাস। মওলানা দাউদ গজনভি, মাষ্টার তাজুদ্দিন আন্‌সারি সৈয়দ মুজাফ্‌ফার আলি শাম্‌সী এবং আরও কোনো কোনো ব্যক্তি এ-ও বলেছেন যে, ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ গণ-পরিষদ যে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করেন, তা' থেকে স্বাভাবিক ভাবেই এ-দাবীগুলি বেরোয়।

তদন্তের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই ধরে নিয়েছেন, যে মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রে পাকিস্তানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছিল এবং কেউ কেউ ওয়াদাও করেছিলেন—এই দাবীগুলি সেই মতবাদেরই ফলাফল। দাবীগুলির যৌক্তিকতা বিচার করতে হলে একটা জিনিস স্পষ্ট ক'রে বুঝতে হবে; সেটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে তথা ইসলামে মুসলমান ও অমুসলমান নাগরিকদের অধিকারের মধ্যে মৌলিক তফাত রয়েছে। একটা বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্রের শাসন-কার্যের উচ্চ পর্যায়ে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং আহ্‌মদিরা যদি মুসলিম না হয়ে কাফের হয়, তবে রাষ্ট্রের কোনো উঁচু পদেই তারা থাকতে পারবে না। এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই দু'টি দাবীতে বলা হয় যেন চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান ও আর আর আহ্‌মদিদের উঁচু রাষ্ট্রীয় পদ থেকে সরিয়ে দে'য়া হয়। তৃতীয় দাবীতে আহ্‌মদিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব'লে ঘোষণা করতে বলা হয় যাতে ভবিষ্যতে কোনো আহ্‌মদী এ-রকম কোনো পদ দখল করতে না পারে।

ব্যাপারটি যেহেতু মৌলিক এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু আদালত আলেমদের সাহায্য নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মতবাদ এবং তার ফল স্বরূপ কি বুঝায়, সে-সম্পর্কে গভীর ভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখেছেন। সে-গুলিই এখন বর্ণনা করা হচ্ছে।

ইসলামী রাষ্ট্র

কমিশনের সম্মুখে অনেকেই জবানবন্দীতে বলেছেন যে, পাকিস্তান দাবীর ভেতর একটি ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী অন্তর্নিহিত ছিল। পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রাম করছিলেন এমন সব বড় বড় নেতাদের কিছু বক্তৃতাও এই মত গঠনের জন্যে দায়ী। ইসলামী রাষ্ট্রের কথা যখন এই সব নেতারা বলেছেন তখন তাঁদের মনে হয়ত ছিল ইসলামী অনুশাসন, ব্যক্তিগত আইন, নৈতিক বিধি ইত্যাদি মিশিয়ে বা তার উপর ভিত্তি ক'রে গড়া একটি আইনগত কাঠামোর ছবি। পাকিস্তানে ধর্মীয় রাষ্ট্র রচনা করা সম্পর্কে যাঁরা তলিয়ে চিন্তা করেছেন তাঁদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই এ ধরণের পরিকল্পনার পথে যে-সব কঠিন অসুবিধা এসে দেখা দেবে তা এড়ায়নি। ডক্টর ইকবাল যিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম চিন্তা করেন, তিনি ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ দিতে যেয়ে' বলেন:

> "স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র তৈরী হলে সেখানে ধর্মীয় শাসন প্রচলন করা হবে এমন ভয় হিন্দুদের করা উচিত নয়। প্রত্যেক গ্রুপেরই নিজেদের ইচ্ছামতো উন্নতি করার অধিকার আছে, এই নীতির পেছনে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নেই।"

দাঙ্গার দায়িত্বের প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা কালে দেখা যাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে দাবীগুলি পূরণের জন্যে যে-সব দল আজ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেগুলি তারা সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের আইডিয়ার বিরোধী ছিল। এমন কি জামাত-ই-ইসলামীর নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদীর মত ছিল যে, যদি নতুন মুসলিম রাষ্ট্র কোনোকালে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে তার শাসন-ব্যবস্থা একমাত্র ধর্ম-নিরপেক্ষই হতে পারে।

বিভাগের পূর্বে, কায়েদে আজম সর্বপ্রথম পাকিস্তানের রূপ সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নয়াদিল্লীতে রয়টারের সংবাদদাতা মিঃ ডুল ক্যাম্পবেলের সংগে এক সাক্ষাৎকারে। কায়েদে আজম বলেছিলেন, নতুন রাষ্ট্র হবে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব থাকবে জনসাধারণের হাতে এবং নতুন জাতির সবারই ধর্ম, গোত্র বা মতবাদ নির্বিশেষে নাগরিকত্বের সমান অধিকার থাকবে। পাকিস্তান লাভের পর, ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান বিধান পরিষদে এক স্মরণীয় বক্তৃতায় কায়েদে আজম নতুন রাষ্ট্রের মূল নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন:

> "তবুও, এই বিভাগের বেলায় উভয় দেশেই সংখ্যালঘু লোকদের বসবাসের প্রশ্ন এড়ান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটা কিছুতেই এড়ান গেল না। এর আর কোনো সমাধান নেই। এখন আমরা কি করবো? যদি আমরা এই মহান পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করতে চাই তবে আমাদেরকে একান্ত-ভাবে এবং পূর্ণভাবে জনসাধারণের বিশেষ করে' জনগণ ও দরিদ্রদের উন্নতির কাজে মন দিতে হবে। যদি আপনারা অতীতের তিক্ততা ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন, আপনাদের সফলতা অনিবার্য। যদি আপনারা অতীতকে বদলিয়ে ফেলেন এবং এক সংগে এই মনোভাব নিয়ে কাজ ক'রে যান যে, প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্রেরই নাগরিক এবং প্রত্যেকেরই সমান অধিকার, সুবিধা এবং কর্তব্য রয়েছে—সে যে-কোনো সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, অতীতে আপনাদের সম্পর্ক যা-ই

থাক না কেন এবং গায়ের রং, গোত্র বা মতবাদ যা-ই হোক না কেন—তা হলে আপনাদের উন্নতির সীমা থাকবে না।

"আমি ব্যাপারটির উপর এর চেয়ে আর জোর দিতে পারি না। এই মনোভাব নিয়ে আমাদের কাজে হাত দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘোর-প্যাঁচ বিলীন হয়ে যাবে, কেননা মুসলমানদের মধ্যেও পাঠান, পাঞ্জাবী, শিয়া, সুন্নী ইত্যাদি এবং হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয় এবং বাঙালী, মাদ্রাজী ইত্যাদি আরো অনেক প্রকার ভেদাভেদ আছে। এবং আমার মতে এই দলভেদই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে; এ না থাকলে বহু পূর্বেই আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বসবাস করতে পারতাম। কোনো শক্তিই অন্য জাতিকে, বিশেষ ক'রে চল্লিশ কোটি লোককে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে পারে না; এই ভেদাভেদ না থাকলে কোনো জাতিই আপনাদেরকে পরাজিত করতে পারতো না বা পারলেও বেশীদিন অধীনে রাখা সম্ভব হোতো না। (হাততালি)। সুতরাং এর থেকে আমাদের একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আপনারা স্বাধীন; আপনারা স্বাধীনভাবে মন্দিরে যেতে পারেন, মসজিদে যেতে পারেন বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্য যে-কোনো উপাসনাগারে যেতে পারেন। যে-কোনো ধর্ম, গোত্র বা বিশ্বাসের লোক হতে পারেন আপনি—রাষ্ট্রের কাজের সংগে তার কোনো সম্পর্কই নেই। (আনন্দ-ধ্বনি)। আপনারা জানেন যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আজ ভারতবর্ষে যে অবস্থা বিদ্যমান কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ ছিল। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টাণ্টগণ পরস্পর পরস্পরকে নির্যাতন করেছে। আজও এমন কতিপয় রাজ্য বর্তমান আছে যেখানে এক শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে পার্থক্যমূলক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ মেহেরবান, আমরা সেই যুগে শুরু করছি না। আমরা এমন যুগে শুরু করছি যখন কোনো ভেদাভেদ প্রথা নেই, এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, এক গোত্র বা বিশ্বাস-অবলম্বী থেকে অন্য দলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। আমরা এই মৌলিক নীতি নিয়ে শুরু করছি যে, আমরা এক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান নাগরিক। (উচচ আনন্দধ্বনি)। কালে ইংলণ্ডের লোকদের বাস্তবের মুখোমুখী হতে হয়; তাদের সরকারের দেওয়া দায়িত্বভার তাদের বহন করতে হয়; ধাপে ধাপে তাদের এই পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়। আজ সুবিচার সহকারেই হয়ত বলা যায় যে, রোমান ক্যাথলিক বা প্রোটেস্টাণ্টের অস্তিত্ব নেই: যা আছে সেটা হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি লোক গ্রেট ব্রিটেনের একজন নাগরিক, সমান নাগরিক এবং তারা সবাই জাতির সদস্য।

"তাই, আমি মনে করি এই ব্যাপারটি আমাদের আদর্শ হিসেবে সামনে রাখা উচিত এবং তা হলেই দেখবেন কালে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমান আর মুসলমান থাকবে না; অবশ্য ধর্মীয় অর্থে নয়, কেননা ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস; কথাটা হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে।"

কায়েদে আজম ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এবং যে উপলক্ষে তিনি এ কথাগুলি বলেছিলেন তা ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের পয়লা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশের হিন্দু-মুসলিম সব জনসাধারণ এবং বাইরের দুনিয়া উভয়কে লক্ষ্য ক'রেই বক্তৃতাটি দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, যে আদর্শ হাসিলের জন্যে নূতন রাষ্ট্র তার সব শক্তি নিয়োজিত করতে যাচ্ছে তাকে যতদূর সম্ভব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। এই বক্তৃতায় অতীতের তিক্ততা সম্পর্কে বারবার উল্লেখ করা হয় এবং এই অতীতকে ভুলে যেয়ে সব তিক্ততা বিসর্জন দেওয়ার জন্যে আবেদন করা হয়।

দেশের ভবিষ্যৎ বাসিন্দা এমন একজন নাগরিক হবে যার গায়ের রং, গোত্র, বিশ্বাস বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমান অধিকার, সমান সুবিধা এবং সমান কর্তব্য থাকবে। 'জাতি' শব্দটি একাধিকার ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে বলা হয় যে, রাষ্ট্র পরিচালনার সংগে এর কোনো যোগাযোগ নেই। ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র।

আদালত আলেমদের জিজ্ঞাসা করেন রাষ্ট্র সম্পর্কে এই মতবাদ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি-না। তাদের প্রত্যেকেই সাফ জবাব দেন, না। এদের মধ্যে আহরাররা ছিলেন এবং আরো ছিলেন ভোল-বদলানো কংগ্রেসীরা —যাদের কাছে বিভাগের পূর্বে এই মতবাদ তাদের বিশ্বাসেরই অংগ বলে গণ্য হতো। মওলানা আমিন আহসান ইসলাহীর সাক্ষ্য যদি জামাত-ই-ইসলামির সঠিক মত বলে ধরা যেতে পারে, তবে এই আইডিয়ার উপর ভিত্তি ক'রে গড়া রাষ্ট্র হবে শয়তানের সৃষ্টি। তাঁর এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদীর কয়েকটি লেখা থেকে। আলেমদের কেউ-ই জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি-করা কোনো রাষ্ট্র সহ্য করতে রাজী নন। তাদের মতে 'মিল্লাত' এবং মিল্লাত বলতে যা কিছু বুঝায় একমাত্র তা-ই হবে রাষ্ট্র চালনের মাপকাঠি।

একটি আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে কায়েদে আজমের মতবাদ নাকি ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ তারিখে আদর্শ প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংগে সংগে অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব যদিও মোটা মোটা শব্দ ও ধারায় ভর্তি, তবু ও একটা চালাকি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামি রাষ্ট্রের কোন নাম-নিশানা তো এর ভেতর নেই-ই, বরং মৌলিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে যে ধারা আছে সেগুলি ইসলামি রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি

তা'হলে ইসলামী রাষ্ট্র, যার সম্পর্কে সবাই বলে অথচ কেউ চিন্তা করে না, জিনিসটি কি? এর জবাব আবিষ্কারের আগে, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এবং তার ক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

মুসলমানদের ইতিহাস থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের নজির দেখাতে বললে আলেমরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। শিয়া আলেম হাফিজ কিফায়াত হোসেন বলেন, রসুলের জামানার শাসন-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ ব্যবস্থা। অন্যদিকে মওলানা দাউদ গজনভীর নজীরের তালিকার মধ্যে অতিরিক্ত আছে ইসলামী সাধারণতন্ত্রের জামানা, উমর বিন্ আবদুল আজীজের রাজত্বকাল, দামেস্কের সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর রাজত্বকাল, গজনীর সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ তুঘলক ও আওরঙ্গজেবের জামানা এবং ছাউদী আরবের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা। অধিকাংশ আলেম যে-যুগের উল্লেখ করেন সেটি হচ্ছে ৬৩২ থেকে ৬৬১ খৃষ্টাব্দের ইসলামী সাধারণতন্ত্রের যুগ। যুগটি বছর তিরিশেকের ও কম। কেউ কেউ এর সংগে উমর বিন্ আবদুল আজীজের অত্যন্ত স্বল্পকালীন রাজত্বেরও উল্লেখ করেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী বলেন, আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের খুঁটি-নাটি আলেমরা বের ক'রে নেবেন। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে মাষ্টার তাজুদ্দীন আনসারীর মত যে কিরূপ ঘোলাটে তা তার জবানবন্দীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে ধরা যায়ঃ

"প্রশ্নঃ খিলাফত আন্দোলনের সংগেও আপনি ছিলেন নাকি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ ভারতে খিলাফত আন্দোলন কখন বন্ধ হয়?

উঃ ১৯২৩ সালে। তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব'লে ঘোষিত হবার পর।

প্রঃ তুরস্কে খিলাফাত তুলে দেওয়ার বহু পরেও খিলাফত আন্দোলন চলতে থাকে, এটা কি সত্য?

উঃ আমার যতদূর মনে পড়ে, তুরস্কে খিলাফত তুলে দেওয়ার সাথেই খিলাফত আন্দোলন শেষ হয়ে যায়।

প্রঃ শুনা যায়, ১৯২৮ সাল পর্যন্ত আপনি খিলাফত আন্দোলনের সদস্য ছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। এটা কি সত্য?

উঃ এ সত্য হতে পারে না।

প্রঃ খিলাফতের প্রতি কংগ্রেসের নজর ছিল কি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ আপনার কাছে খিলাফত কি ধর্মীয় বিশ্বাসের বস্তু ছিল, না কেবল একটা রাজনৈতিক আন্দোলন?

উঃ এটা একটা পুরোপুরি ধর্মীয় আন্দোলন ছিল।

প্রঃ খিলাফত আন্দোলনের প্রতি মিঃ গান্ধীর সমর্থন ছিল কি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ খিলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল কি?

উঃ ইংরেজরা তুরস্কের খিলাফত ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করছিল এবং ইংরেজের এই ব্যবহারে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়।

প্রঃ মুসলমানদের মধ্যে খিলাফতের পুনর্জাগরণই কি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না?

উঃ না।

প্রঃ আপনার মতে খিলাফত কি মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অংগ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ তা হলে আপনি কি পাকিস্তানে খিলাফত প্রতিষ্ঠা চান?

উঃ হাঁ।

প্রঃ মুসলমানদের খলিফা একজনের বেশী হতে পারে কি?

উঃ না।

প্রঃ পাকিস্তানের খলিফা কি সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরও খলিফা হবে?

উঃ হওয়া উচিত কিন্তু সম্ভব নয়।''

রাজনৈতিক চিন্তাধারার বয়স তিন হাজার বছর। প্রাথমিক যুগে এই চিন্তাধারা ধর্ম থেকে আলাদা ক'রে দেখা যায় না। তবে সব যুগেই দু'টি প্রশ্ন অবশ্যই উঠেছে:

(১) রাষ্ট্রের সঠিক কার্যাবলী কি? এবং

(২) রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করবে কে?

যদি রাষ্ট্রীয় কার্যের সত্যিকার ক্ষেত্র হয় ব্যক্তির কল্যাণ, তা সে পার্থিব বা আধ্যাত্মিক বা উভয়ই হোক, তা হলে প্রথম প্রশ্নটি থেকে সোজাসুজি আরেকটা বড় প্রশ্ন বেরোয়: মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং মানুষের শেষ ভাগ্য-পরিণতি কি?

এ-ব্যপারে, একই সময়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের মত চালু থাকতে দেখা গেছে। বিষুব-রেখাস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার বামন লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে, তাদের দেবতা 'কমুবু' তাদেরকে শিকার, নাচ ও গান করার জন্যেই বনে পাঠিয়েছে। সম্ভবতঃ একই অর্থে ইপিকিউরিয়ানরা বলেছিল যে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পান করা, খাওয়া এবং ফুর্তি করা; কারণ মৃত্যু হলে আর এই আনন্দ উপভোগ করা যায় না। ইউটিলিটারিয়ান যাঁরা, তাঁরা বলেন, এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন ও দেহের আনন্দময় অনুভতির স্বাদ গ্রহণ করা, এর পরে যাই হোক না কেন। ত্যাগে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন সকল প্রকার দৈহিক কামনা সীমাবদ্ধ করতে। জার্মান দার্শনিকদের মতে ব্যক্তির জীবন হচ্ছে রাষ্ট্রের জন্যে, সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সেবা। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা বাহুবল, প্রাকৃতিক বাছাই এবং বাঁচবার জন্যে প্রতিযোগিতামলক সংগ্রামে বিশ্বাস

করতেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে সেমিটিক মতবাদ হচ্ছে—সে ইহুদি হোক বা খৃষ্টান বা ইসলামী হোক,—মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো পরজীবনের জন্যে নিজেদেরকে তৈরী করা; অতএব উপাসনা এবং নেক কাজই হচ্ছে একমাত্র করণীয় কাজ। সক্রেটিস থেকে শুরু ক'রে সব গ্রীক দার্শনিকেরাই মনে করতেন, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ধারের জন্যে দার্শনিক আলোচনায় মশগুল থাকা; অন্যদের কাজ হচ্ছে দার্শনিকদের ভরণ-পোষণ যোগান। ইসলাম এই মতবাদে জোর দেয় যে, এ জীবনই শেষ জীবন নয়, অনন্ত জীবন শুরু হয় এই জীবন শেষ হবার পর; সুতরাং পরবর্তী জীবনের মর্যাদা নির্ভর করবে এ জীবনের কার্যাবলীর উপর। বর্তমান জীবন যেহেতু কোনো উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্যের একটি বাহক মাত্র, শুধু ব্যক্তি কেন রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হচ্ছে পরজীবনে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদা লাভের উপযোগী করে এ জীবনে মানুষের কার্যাবলী পরিচালনা করা। ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদ এর উল্টো, কেননা পরজীবনের পরওয়া তাতে নেই। ইসলাম ধর্ম পূর্বোক্ত আদর্শ হাসিল করতে চায়। কাজেই সংগে সংগে যে প্রশ্নটি জাগে, তা হচ্ছেঃ ইসলাম কি এবং মুমিন বা মুসলমান কে?

কমিশন আলেমদের কাছে এই প্রশ্ন করেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতের একেবারেই কোনো মিল নেই, যদিও এই প্রশ্নের মীমাংসা করা তাঁদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ বিষয়ে এই সব বড় বড় ধর্মীয় আলেমগণ যে-সব মত প্রকাশ করেছেন, তা ছাড়াও কমিশনের মতে প্রত্যেকটি সুশৃংখল ধর্মের মতো ইসলামও এমন একটি জীবন-পদ্ধতি নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় যার অন্তর্ভুক্তঃ—

(১) বিশ্বাসের মূল সূত্র;

(২) ধর্মীয় ব্যাপারে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য;

(৩) নৈতিক ব্যবহারের রীতি-নীতি;

(৪) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি; এবং

(৫) আইন।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যে-সব নিয়মাবলী আছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে 'ওহী' বা দৈববাণী, যুক্তি নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি থাকতে পারে। এই মিল অবশ্য নেহায়েত দৈবাৎ, কারণ মানুষের যুক্তির মধ্যে ভুল থাকতে পারে এবং চরম যুক্তি হচ্ছে খোদার কাছে যিনি মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে পয়গাম্বরের মারফত বাণী পাঠান। সুতরাং মুসলিম হ'লে তাকে এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কীয় নির্দেশাবলী অবশ্যই মেনে নিতে হবে—যদিও তা যুক্তির দিক দিয়ে স্পষ্ট না হয়, এমন কি যদি মানুষের যুক্তির বিরোধী হয় তবুও। যেহেতু খোদার পক্ষে ভুল করা অসম্ভব, সেহেতু খোদা যা কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তা সে যে-কোনো ব্যাপারেই হোক—যেমন ইতিহাস, অর্থনীতি, আইন, মানুষের জন্ম, বিবর্তন বা জোতির্বিদ্যা—অবশ্যই চরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যুক্তির বিচারই আসল বিচার নয়। এ সব অস্বীকার করলে 'কুফর' বা 'অবিশ্বাস'-এর পাতক হবে, কেননা তার ফলে আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ জ্ঞান ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হবে।

যুগে যুগে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এর মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ছিলেন শেষ। আল্লাহ্ তাঁর কাছে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তা কোরানে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ই হচ্ছে এর মোটামুটি আলোচ্য বস্তু। সুতরাং ইসলামে যিনি বিশ্বাস করেন তাঁর সত্যিকার কাজ হচ্ছে খোদার বাণী বুঝা, তাকে বিশ্বাস করা এবং তা পালন করা।

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

খোদা যাঁদের মাধ্যমে তার বাণী প্রচার করেন তাঁরা হচ্ছেন রসুল বা নবী। যেহেতু নবীদের প্রত্যেকটি কথা বা কার্যাবলী খোদার ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, সেহেতু খোদার বাণীর মতো এগুলিও নির্ভুল—আমাদের নবীর বেলায় এ কথা অবশ্যই সত্য—কেননা নবীরা খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করতে বা বলতে পারেন না। নবীদের কাজ এবং কথাকে 'সুন্নাত' বলা হয়। সুন্নাতের সংকলনকে হাদিস বলে। এর অনেকগুলি খণ্ড আছে। অনেক সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করার পর মুসলিম জ্ঞানান্বেষিগণ এই সংকলন তৈরী করেন।

হাদিসের অর্থ হচ্ছে রসুল এবং তাঁর সাহাবাদের কথা এবং কাজের লিপি। প্রথমে ছাহাবারাই ছিলেন সুন্নার জ্ঞান সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এরপর রসুলের পরবর্তী প্রথম যুগের লোকদের এবং তারও পরে দ্বিতীয় যুগের লোকদের কথাই নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। রসুলের বাণী সম্বলিত হাদিসকে মারফু, বলা হয়। সাহাবাদের বাণী এবং কার্যের উল্লেখ আছে এমন হাদিসকে 'মওকুফ' বলা হয়। রসুলের পর বা প্রথম যুগের লোকদের কথা এবং কার্যের উল্লেখ আছে এমন হাদিসকে 'মাকতু' বলা হয়। কোনো কোনো হাদিসে আল্লাহ্‌র নিজস্ব বাণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরণের হাদিসকে 'হাদিসে কুদসি' বা 'ইলাহি' বলা হয়। হাদিসে-নবভী থেকে এগুলি বিশিষ্ট।

রসুলের মুখ-নিসৃত বাণীর একটি বিরাট অংশে যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে তা হচ্ছে ন্যায়-সঙ্গত কাজকর্ম, ধর্মীয় কর্তব্য, হালাল ও হারাম, পবিত্রতা, খাদ্যের নিয়মাবলী এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, ধর্মীয় বিশ্বাস, শেষ বিচারের দিনে গোনাহ্‌র মাফ, দোজখ এবং বেহেশ্‌ত, ফেরেশ্‌তা, সৃষ্টি, 'ওহী' এবং প্রাক্তন নবীদের সম্পর্কেও এতে আলোচনা আছে। বহু হাদিসে রসুলের নীতিবাক্য ও নৈতিক শিক্ষা রয়েছে।

হাদিসের গুরুত্ব প্রথম থেকেই উপলব্ধি করা হয়েছিল এবং সেগুলি শুধু মুখস্থই করা হয়নি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখেও রাখা হয়। হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে। এই শতাব্দীতেই 'ছিহাহ্-ছিত্তা' সংকলন করা হয়। এগুলি সংকলন করেন—

(১) আল বোখারী, মৃত্যু ২৫৬/৮৭০;
(২) মুসলিম, মৃত্যু ২৬১/৮৭৫;
(৩) আবু দাউদ, মৃত্যু ২৭৫/৮৮৮;
(৪) আল-তিরমিজি, মৃত্যু ২৭৯/৮৯২;
(৫) আল-নাছাই, মৃত্যু ৩০৩/৯১৫; এবং
(৬) ইব্‌ন-ই-মাজা, মৃত্যু ২৭৩/৮৮৬

দলিলের আধুনিক আইন অনুসারে (পাকিস্তানে প্রচলিত আইন সহ) সুন্নার ব্যাপারে হাদিস অগ্রাহ্য দলিল, কেননা প্রত্যেকটি হাদিসে অমুক অমুকের থেকে শুনেছেন বলে কয়েকবার উল্লেখ আছে; কিন্তু আইনের উপরে তার কর্তৃত্ব গ্রহণীয়। সেকালে গোঁড়া সমাজে যা কিছু নির্ভরযোগ্য বলে গৃহীত ছিল, 'ছিহাহ্-ছিত্তা'য় সবই লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এখানেই এই সংকলনগুলির মূল্য। অনেকের ভুল ধারণা যে, সংকলনকারীরা বহু সহস্র চলতি হাদিস থেকে সর্বপ্রথম বাছাই করেন কোনগুলি বিশুদ্ধ এবং কোনগুলি ভেজাল।

শিয়ারা হাদিসকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভংগি থেকে বিচার করে। কেবল হজরত আলী (রঃ) এবং তার অনুসরণকারীদের সাক্ষ্য সম্বলিত হাদিসকেই তারা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে। এই বিষয়ের উপর তাদের নিজস্ব গ্রন্থাদি আছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে, রীতি-নীতি, মত-বিশ্বাস এবং প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করলে, অধিকাংশ হাদিস-প্রচারকের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কিছুটা মতৈক্য

দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কেউ আর এ সব হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। এই সত্যতা ছিহাহ্-ছিত্তার বেলায়ও তখন থেকে প্রযোজ্য হয়ে আসছে।

আমরা এ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কোনো বিষয় সম্পর্কে কোরান বা রসুলের সুন্নার যে-কোনো বিধি প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু যেহেতু সুন্নার একমাত্র দলিল হচ্ছে হাদিস, অতএব সুন্না ও হাদিস কথা দু'টি একে অপরের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে; ফলে যেখানে কোরান ও সুন্না বুঝানোর ইচ্ছা সেখানে লোকে প্রায়ই কোরান ও হাদিস বলে থাকে।

এই স্থলে আরেকটি মৌলিক নীতি আসে। সেটি হচ্ছে যে, ইসলাম খোদার প্রেরিত শেষ এবং সম্পূর্ণ ধর্ম এবং খোদা কখনই এর কোনো কিছু রদ-বদল করবেন না বা কোনো নতুন নবী পাঠাবেন না। ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটীহীন করা হয়েছে বলে আর কোনো রদবদল বা নতুন নবী প্রেরণের প্রয়োজন হবে না। এই অর্থে হজরত রসুলের সংগে সংগে নবুয়াত শেষ হয়ে যায় এবং 'ওহী' নাজেল চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলিম মত-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা সবই নির্ভুলতার মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—তা সে নির্ভুলতা কোরানেরই হোক বা হাদিস, ইজমা বা ইজতিহাদে মুতলাকেরই হোক—এই সিদ্ধান্ত যদি পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়, তবে এর থেকে যে-সব অনুসিদ্ধান্ত বেরোয় তা সহজেই বুঝা যায়। যেহেতু আনুষ্ঠানিক বা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে সত্যের প্রমাণ হচ্ছে খোদার নাজেলকৃত বাণী যা কোরানে পাওয়া যায় এবং যেহেতু সুন্না (যার দলিল হচ্ছে হাদিস) নাজেলকৃত বাণীর মতোই নির্ভুল, সুতরাং যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবহার্য সঠিক নীতি বের করা, তা সে কোরান থেকেই হোক বা হাদিস থেকেই হোক। স্বভাবতঃই এ ব্যাপারে সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন কোরান ও হাদিসের অধ্যয়নকে যাঁরা জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সুন্নীদের মধ্যে আলেমগণ এবং শিয়াদের মধ্যে মুজ্‌তাহিদগণ। এঁদের কাজ হবে বিশেষ অবস্থায় কি নিয়ম প্রযোজ্য হবে সেটা খুঁজে বের করা। কাজটা হবে গ্রীক দার্শনিকদের কাজের মতো। পার্থক্যটা হবেঃ গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করতেন প্রকৃতির মধ্যে সত্য বিরাজ করছে, মানুষের কাজ হচ্ছে সেটা চেষ্টা ক'রে খুঁজে বের করা, আর আলেমদের ও মুজতাহিদদের কাজ হবে কোরান ও হাদিসের মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে তা আবিষ্কার করা। উলামা বোর্ড গঠন করার জন্যে মূল-নীতি কমিটীর সোপারেশ ছিল এই নীতিরই যুক্তিগত স্বীকৃতি। বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তি হওয়া উচিত ছিল যে, উদ্দেশ্য হাসিলের পক্ষে এই বোর্ডের ক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়।

ইজমার অর্থ হচ্ছে মুজতাহিদদের মতের মিল—এমন মুজতাহিদ যারা রসুলের পরে নিজস্ব জ্ঞানের গুণে বিচার ক্ষমতার অধিকারী। ইজমার যথার্থতার ভিত্তি হচ্ছে ভুলের বিরুদ্ধে ঐশী রক্ষাকবচ। এর গোড়ায় রয়েছে রসুলের একটি মৌলিক হাদিস—"আমার উম্মত কখনো কোনো ভুলের উপরে একমত হবে না।" এই হাদিসটি ইবনে মাজায় আছে। এই নিয়মের দ্বারা যে-সব বিষয়ে অনৈক্য ছিল তার সমাধান করা হয়। সমাধানের পর সে-সব বিষয়গুলি বিশ্বাসেরই অংগ হয়ে দাঁড়ায়; অবিশ্বাস করলে সেটা 'কুফর'-এর কাজ হবে। ইজমা সম্পর্কে যে বিশেষ কথাটি খেয়াল রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে, মুজতাহিদদের ঐক্যমতই হচ্ছে ইজমা, জনসাধারণের ঐক্যমত এর আওতার বাইরে। অতএব ইজমা কেবল গরমিলেরই মিল করেনি, বহু গুরুত্বপূর্ণ মীমাংসিত মতবিশ্বাসকেও পালটে দিয়েছে।

ইজমা ও ইজতিহাদের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে: ইজমা সমষ্টিগত, ইজতিহাদ ব্যক্তিগত। ইজতিহাদের অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয় বা আইনের নীতি সম্পর্কে কোনো মতে পৌঁছার জন্যে নিজের চরম প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা। এটা করা হয় কোরান ও সুন্নাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিচার ক'রে। প্রথমে ইজতিহাদে নির্ভুলতার প্রশ্ন ছিল না। ইজতিহাদের ফলাফলে সব সময়ই বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ইজতিহাদের সম্মেলনের ফলেই ইজমার সৃষ্টি হতো এবং সেটা হতো নির্ভুল। কিন্তু শীগ্‌গীরই এই সাধারণ ইজতিহাদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষ ইজতিহাদে পরিণত হলো। পরবর্তী কালের অনুসন্ধানকারিগণ চারটি আইনসংগত মতবাদী শ্রেণীর ভিত্তিমূল খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, এঁদের প্রতিষ্ঠাতাগণ পয়লা দরজার ইজতিহাদের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যুগে যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা ইজতিহাদের আদি অর্থে ফিরে গেছেন এবং প্রাথমিক নীতি-সমূহ থেকে নিজেদের মত গঠন করার অধিকার দাবী করেছেন।

এঁদের একজন হলেন হাম্বলী সম্প্রদায়ভুক্ত ইব্‌নে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮)। আরেকজন হচ্ছেন সুয়ুতি (মৃত্যু ৯১১)। তিনি শুধু ইজতিহাদেরই দাবী করেন না, সে শতাব্দীর মুজাহিদ বা ধর্মের সংস্কারকারী বলেও নিজেকে দাবী করেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক শতাব্দীতে যেমন একজন 'মুজাদ্দিদ' আসবেন, তেমনি প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ একজন ক'রে মুজাহিদ-ও থাকবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে কি কি অত্যাবশ্যকীয়

যেহেতু ইসলামী আইনের ভিত্তি হচ্ছে ঐশীবাণী ও রসুলের নির্ভুলতা, সুতরাং কোরান ও সুন্নায় যে আইন পাওয়া যাবে তা' হবে মানুষের তৈরী সমস্ত আইনের উপরে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রথম-টার কাছে পরেরটাকে মাথা নত করতেই হবে। সুতরাং কোরানে বা সুন্নায় শাসনতন্ত্র আইন বা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে কোনো বিধি থাকলে, অবশ্যই তা কার্যকরী করতে হবে। ইসলামী আইনে শাসনতন্ত্র আইন ও অন্য আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোরান ও সুন্নায় যে আইন পাওয়া যাবে তার পুরোটাই রাষ্ট্রের মুসলিম প্রজাদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের অংশ হতে হবে। অনুরূপভাবে, অন্য রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্কের ব্যাপারে কোরানে বা সুন্নায় কোনো বিধি থাকলে অন্য বিধির মতোই তা' অবশ্য পালনীয়। সুতরাং পাকিস্তানকে যদি খাঁটী ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয় বা করার ইচ্ছা থাকে, তবে এর শাসনতন্ত্রে নিম্নের পাঁচটি বিধি অবশ্যই থাকতে হবে:

(১) কোরান বা সুন্নায় যা কিছু আইন পাওয়া যাবে তাকে রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের জন্যে প্রযোজ্য দেশের আইনেরই অংশ ব'লে গণ্য করতে হবে এবং সে অনুসারে তাকে কার্যকরী করতে হবে।

(২) সর্বজনমান্য আলেম ও মুজতাহিদ্‌দের ইজমার দ্বারা যদি শাসনতন্ত্র তৈরী না হয় তবে সে শাসনতন্ত্রে কোরান ও সুন্নার বিরোধী কোনো কিছু থাকলে তা রদ হয়ে যাবে।

(৩) পাকিস্তানের বর্তমান আইনাদি যদি অনুরূপ ইজমার দ্বারা গৃহীত না হয়, তবে তাতে কোরান ও সুন্নার বিরোধী কোনো কিছু থাকলে তা রদ হয়ে যাবে।

(৪) ভবিষ্যতের কোনো আইনে কোরান ও সুন্নার বিরোধী কোনো বিধি থাকলে তা রদ হয়ে যাবে।

(৫) আন্তর্জাতিক আইনের কোনো বিধি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির কোনো ধারা যদি কোরান ও সুন্নার বিরোধী হয়, তবে পাকিস্তানের কোনো মুসলমানের পক্ষে তা প্রযোজ্য হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র ঃ

আলেমরা স্বীকার করেছেন ঃ পাকিস্তানে যদি ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সরকার গড়তে হয় তবে সে সরকার গণতান্ত্রিক হতে পারবে না। কোরান ও সুন্নার সার্বভৌমত্বের মতবাদ এর আগেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অবস্থাকে স্বীকার ক'রেই আদর্শ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, সব রকমের সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছেন সেই একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। কিন্তু যাঁরা প্রস্তাবের রচয়িতা তাঁরা 'সার্বভৌম' ও 'গণতন্ত্র' শব্দ দু'টির অপব্যবহার ক'রে বলেছেন যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্যে যে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হবে তাতে ইসলামী কায়দার গণতন্ত্রের আদর্শ পুরোপুরি পালন করা হবে। যে স্থলে এ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে হয়ত ইসলামী কানুনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝবার বেলায় ভুল বুঝেননি; কিন্তু যেহেতু শব্দ দু'টি পশ্চিমী রাজনৈতিক দর্শন থেকে ধার করা, সেহেতু মর্ম হিসাবে প্রস্তাবটিতে এদের ব্যবহার ভুল হয়েছে। যখন বলা হয় কোনো দেশ সার্বভৌম, তার অর্থ এই যে, নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র-কার্য পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে এর জনসাধারণের বা কোনো দল বিশেষের। এই অর্থে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র সার্বভৌম হতে পারে না; কেননা তারা কোরান বা সুন্নার কোনো আইনের রদ-বদল করতে পারবে না। কোনো রাষ্ট্রের আইন তৈরীর ক্ষমতার উপর চরম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে, রাষ্ট্রের জনসাধারণের সার্বভৌমত্বেরই নিয়ন্ত্রণ করা হলো। এই নিয়ন্ত্রণের গোড়া যদি জনসাধারণের ইচ্ছা না হয়ে অন্য কিছু হয়, তবে অনুরূপ পরিমাণে রাষ্ট্রের ও এর জনগণের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। ইসলামী রাষ্ট্রে আইনগত অর্থে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের রাজ— যেমন প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রত্যক্ষভাবে, অথবা আধুনিক যুগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজে, আইন তৈরীর কাজে অথবা শাসন-কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার যদি কতকগুলি অপরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধের মধ্যে আটকা পড়ে যায়, তবে এ-কথা বলা যায় না যে, ইচ্ছানুযায়ী তারা যে-কোনো আইন পাশ করতে পারে বা যে-কোনো শাসন-কার্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-পরিষদ যদি ইজমার মতো কোনো কিছু হয়, তবে জনসাধারণ এতে অংশ গ্রহণ করারই উপযুক্ত নয়; কেননা ইসলামী আইনে একমাত্র বিজ্ঞ আলেম ও মুজতাহিদদের মধ্যেই ইজমা সীমাবদ্ধ— গণতন্ত্রের ন্যায় জনসাধারণ পর্যন্ত আর যায় না।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপারে আলেমদের মত

আইন-পরিষদ ও আইন

আইন-পরিষদ বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, ইসলামী ব্যবস্থায় তার কোনো স্থান নেই। যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দীন-ই-ইসলাম বলা হয়, সেটি হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। যে-কোনো পরিস্থিতির জন্যে আইন বের করে তা' কার্যকরী করার উপায় এর ভেতরেই রয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের যুগে আধুনিক অর্থে আইন-পরিষদ বলতে কিছু ছিল না। যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মতো আইন আলেমরাই বের ক'রে দিতেন। নতুন ক'রে আইন তৈরী করার কিছু ছিল না। কেননা আইন তৈরীই ছিল। আইন যাঁরা কার্যকরী করবেন তাঁদের কাজ ছিল বিশেষ অবস্থার উপযোগী আইন খুঁজে বের করা। অবশ্য একবার এ রকম কোনো আইন ব্যবহার করা হলে পরবর্তী শাসকদের জন্যে তা নজিরের কাজ করতো। কেউ কেউ

বলেছেন, পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রে যেখানে মুসলমান ও অমুসলমান বাস করে এবং অমুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ও প্রত্যেক বিষয়ে ভোট দানের অধিকার আছে, সেখানে আইন-পরিষদকে ইজমা বা ইজতিহাদ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ইজতিহাদ ব্যক্তিগত—সমষ্টিগত নয়; এবং ইজমা সমষ্টিগত হলেও যাঁরা আইন-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ নন তাঁদের এতে কোনো স্থান নেই। এই নিয়মের দ্বারা আহ্‌লে কেতাবই হোক বা মুশ্‌রেকই হোক, সব অবিশ্বাসীদের (কুফর) গণ্ডীর বাইরে রাখা হয়েছে।

ইসলাম হচ্ছে একটি ত্রুটী-বিচ্যুতিহীন পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। মনুষ্য জীবনের সকল প্রকারের কার্যকলাপ সম্পর্কেই স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত অনুশাসন এর ভেতরে আছে। সুতরাং আধুনিক অর্থে পরিষদীয়-আইনের কোনো স্থান এতে নেই। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জমিয়াতুল-উলামায়ে-পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবুল হাসানাত জবাব দেন:

"প্র: ইসলামী রাষ্ট্রে আইন-পরিষদ থাকা কি এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ?

উ: না। আমাদের আইন হচ্ছে পূর্ণাংগ—চাই শুধু বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা। আমার বিশ্বাস অনুসারে এমন কোনো বিষয়েই উঠতে পারে না, যে-সম্পর্কে কোরান বা হাদিসে আইন খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্র: সাহিবুল-হাল্লি-অল-আক্‌দ কারা ছিলেন?

উ: এঁরা সমসাময়িক কালের নামজাদা আলেম ছিলেন। এঁরা আইন সম্পর্কে জ্ঞানের বলে নিজেদের মর্যাদা লাভ করেন। আধুনিক গণতন্ত্রী আইন-পরিষদের সংগে এর কোনো সামঞ্জস্য নেই।"

একই অভিমত প্রকাশ করেছেন আমীর-ই-শরিয়ত সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারী। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদের ধর্ম হচ্ছে পূর্ণাংগ এবং ত্রুটীহীন; সুতরাং নতুন কোনো আইন করা হবে কুফরের তুল্য। মওলানা আবুল আলা মওদুদী অবশ্য বলছেন যে, কোরান, সুন্না বা পূর্ববর্তী ইজমায় যে-সব বিষয় সম্পর্কে বিধি নেই, সে-সব বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আইন তৈরী করা যেতে পারে। তিনি তাঁর বক্তব্যটি স্পষ্ট করতে গিয়ে নজির দেখিয়েছেন যে, রসুল এবং তাঁর পরে তাঁর খলিফারা কয়েকজন লোক নিয়োগ ক'রে রাষ্ট্রের সব কাজে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। প্রশ্নটা খানিকটা শক্ত এবং এর গুরুত্ব অনেক। কারণ, মওলানা আবুল হাসানাত এবং আরও কয়েকজন ধর্মীয় নেতা দাবী করেছেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা—মানুষের কার্যাবলীর যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো প্রশ্নের জবাব এর মধ্যে রয়েছে—নতুন ক'রে আইন তৈরী ক'রে ভরাট করার মতো কোনো খানেই ফাঁক নেই। আইন-পরিষদের যে-কোনো রকম ব্যবস্থাকে এই মতের সংগে খাপ খাওয়াতে হবে। আলোচনার নির্দেশ যে ইসলামে আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সমসাময়িক আইনজ্ঞ আলেমদের সংগে কেবল রসুলই আলোচনা করেন নি—প্রথম চারজন খলিফা এবং তাঁদের পরবর্তীরাও করেছেন। আদালতের তদন্তে মজলিসে-শুরা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বেরোয় নি; কেবলমাত্র মওলানা আবুল আলা মওদুদী তাঁর বিবৃতিতে এ-সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেছেন। একদল লোকের সংগে যে পরামর্শ করা হতো, এটা সত্য; কিন্তু উপদেষ্টা দলের স্থায়িত্ব ছিল কি না বা তাঁদের মতামতে আইনের জোর ছিল কি না সে-সম্পর্কে সন্দেহ আছে। এঁরা আধুনিক উপায়ে নিশ্চয়ই নির্বাচিত হননি। যদিও এঁদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ না-ও থাকতে পারে। আধুনিক আইন-পরিষদ যেভাবে আইন তৈরী ক'রে থাকে, তাঁরাও যে সেভাবে আইন তৈরী করতেন, এ-কথা কিছুতেই সত্য নয়। তাঁদের সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই নজির হিসেবে ব্যবহার করা হতো এবং ইজমা ব'লে গণ্য করা হতো। আধুনিক উজির-সভা যেমন পরামর্শ দেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদের মতামতও ছিল তেমনি ধরণের পরামর্শ—আইন নয়।

যদি শাসনতন্ত্র আইনে এ ধরণের কোনো কথা থাকে যে, এর কোনো ধারা কোরান বা সুন্নার বিরোধী হলে নাকচ হয়ে যাবে, তবে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। একই অবস্থার সৃষ্টি হবে যদি কেউ সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে আইন-পরিষদের তৈরী কোনো আইনের বৈধতা এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করে যে, আইন-পরিষদ গঠন করাই কোরান ও সুন্নার বিরোধী।

অমুসলিমদের মর্যাদাঃ

আহ্‌মদীরা অমুসলিম এবং সেহেতু জিম্মীদের মতো তারাও রাষ্ট্রের উচচ পদে বহাল হতে পারে না—এই যুক্তি দেখিয়ে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান ও অন্যান্য আহ্‌মদীদের সরিয়ে দে'য়ার দাবী করা হয়। দাবীর এই দিকটার ফলে একটি প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমরা যদি পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র করি তবে অমুসলিমদের কি মর্যাদা হবে? নামজাদা আলেমদের মতে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা হবে জিম্মীদের মতো। তারা রাষ্ট্রের সত্যিকার নাগরিক হবে না, কেননা তারা মুসলমানদের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে না। আইন তৈরীর ব্যাপারে বা আইন কার্যকরী করার বেলায় তাদের কোনো অধিকার থাকবে না। সরকারী চাকুরী করাও তাদের পক্ষে হবে নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারটি স্পষ্ট ক'রে বর্ণনা করেছেন মওলানা আবুল হাসানাত সৈয়দ মুহম্মদ আহ্‌মদ কাদরী, মওলানা আহ্‌মদ আলী, মিয়াঁ তোফায়েল মোহাম্মদ এবং মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী। প্রশ্নটি সম্পর্কে সওয়াল-জবাবে মওলানা আবুল হাসানাত বলেনঃ

"প্রঃ পাকিস্তান যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তবে অমুসলিমদের কি মর্যাদা হবে? আইন তৈরীর ব্যাপারে, আইন কার্যকরী করার বেলায় বা সরকারী চাকরীতে তাদের কোনো অধিকার বা হাত থাকবে কি?

উঃ তাদের মর্যাদা হবে জিম্মীদের মতো। এর কোনো ব্যাপারেই তাদের কোনো অধিকার থাকবে না।

প্রঃ ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র-প্রধান কি তাঁর ক্ষমতার কোনো অংশ অমুসলিমদের হাতে ন্যস্ত করতে পারেন?

উঃ না।"

মওলানা আহ্‌মদ আলীকে সওয়াল করলে তিনি বলেনঃ

"প্রঃ আমরা যদি পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করি, কাফের বা অমুসলিমদের স্থান কি হবে? আইন তৈরীর ব্যাপারে তাদের কোনো হাত, এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সরকারী দফ্‌তরে কাজ করার তাদের অধিকার থাকবে কি?

উঃ তারা হবে জিম্মীর মতো। আইন প্রণয়নে বা আইন প্রয়োগে তাদের কোনো হাত থাকবে না। সরকারী দফতরে চাকুরী করার অনুমতি অবশ্য সরকার তাদেরকে দিতে পারেন।"

মিয়াঁ তোফায়েল মোহাম্মদের বক্তব্য হচ্ছেঃ

"প্রঃ ১৯৫৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে 'সিভিল ও মিলিটারী গেজেটে' সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি পড়ুন এবং বলুন ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে আপনার মতের সংগে এর মিল আছে কি-না? (প্রবন্ধটিতে বলা হয়, মুসলমান ও সংখ্যালঘুগণ সমান অধিকার ভোগ করবে।)

উঃ আমি প্রবন্ধটি পড়েছি। রাষ্ট্র যদি জামাতের মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পাকিস্তানের খৃষ্টান বা অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় এই সব অধিকার লাভ করতে পারে না।"

নীচের সওয়াল-জবাব থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে জমিয়াতুল-উলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনীর মত কতখানি ঘোলাটেঃ

"প্র: আপনি কখনও (১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে পাকিস্তান বিধান-পরিষদে প্রদত্ত কায়েদে আজমের) বক্তৃতাটি পড়েছেন কি?

উ: হাঁ, পড়েছি।

প্র: এই বক্তৃতায় কায়েদে আজম পাকিস্তান সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন, আপনি কি সে সম্পর্কে এখনও একমত? কায়েদে আজম যেমন বলেছেন, এর পরে মুসলিম ও অমুসলিম মিলে একমাত্র পাকিস্তানী জাতি থাকবে—গোত্র, ধর্ম, মত-বিশ্বাস নির্বিশেষে সবারই সমান নাগরিক অধিকার থাকবে এবং ধর্ম হবে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার।

উ: আমার মত হচ্ছে: রাষ্ট্রের মুসলিম অমুসলিম সবারই জনসংখ্যার অনুপাতে রাষ্ট্র-কার্যে এবং আইন প্রণয়ন ব্যাপারে যোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকবে; তবে অমুসলিমদের সেনা-বাহিনীতে, বিচার বিভাগে, উজীর হিসেবে বা অন্য কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা যেতে পারে না।

প্র: আপনি কি বলতে চান যে, অমুসলিমদের স্থান জিম্মীদের মতো হবে, না এর চেয়ে কিছুটা ভালো?

উ: না। ইসলামী রাষ্ট্র কোনো দেশ জয় করলে সেই দেশের অমুসলিম লোকদের বলা হয় জিম্মী। ইসলামী রাষ্ট্রে আগে থেকেই বসবাসকারী অমুসলমানদের বেলায় এ-কথা খাটে না। এ ধরণের সংখ্যালঘুদের বলা হয় 'মুয়াহিদ' অর্থাৎ যাদের সংগে কোনো চুক্তি করা হয়েছে।

প্র: যদি কোনো চুক্তি না থাকে তবে তাদের মর্যাদা কি হবে?

উ: সে-ক্ষেত্রে এ-সব সম্প্রদায়ের নাগরিকত্বের কোনো অধিকার থাকবে না।

প্র: আপনি কি পাকিস্তানের অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে মুয়াহিদ বলবেন?

উ: যদি কোনো চুক্তি না থাকে তবে তাদের মুয়াহিদ বলা যাবে না। আমার যদ্দুর জানা আছে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সংগে এ-ধরণের কোনো চুক্তি করা হয় নি।"

অতএব দেখা যাচ্ছে, এই বিজ্ঞ আলেমের মতে পাকিস্তানের অমুসলিমগণ নাগরিকও হবে না, জিম্মীও হবে না—মুয়াহিদও হবে না।

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র-প্রধান খলিফা নির্বাচিত হতেন। কিন্তু সে নির্বাচন ছিল আজকের দিনের জনপ্রিয় নির্বাচন প্রথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। নির্বাচনের পরে তিনিই হতেন রাষ্ট্রপরিচালনার সব রকম ধারার উৎস স্বরূপ। শাসন করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই ছিল যদিও তিনি ইচ্ছা করলে বিজ্ঞ আলেমদের নিয়ে মজলিসে-শুরা গঠন করতে পারতেন। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, কাফেরদের এই মজলিসে কোনো স্থান ছিল না এবং খলিফার কোনো ক্ষমতাই তাদের হাতে ন্যস্ত করা যেত না। খলিফাই ছিলেন রাষ্ট্রের আসল প্রধান এবং সব ক্ষমতাই তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল—আজকের দিনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মতো নয়, যাঁর কাজ হচ্ছে উজীরে-আজম ও তাঁর উজীর-সভার সিদ্ধান্তে কেবলমাত্র দস্তখত করা। কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদেই তিনি অমুসলিমদের নিয়োগ করতে পারতেন না, বা আইনের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগে তাদের শরীক করতে পারতেন না। আইন তৈরীর বেলায় তাদের অংশ গ্রহণ ত' ছিল একেবারেই অসম্ভব।

এ-অবস্থায়, রাষ্ট্রকে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্যে এবং সে পার্থক্যের ফলাফল কার্যকরী করার জন্যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সুতরাং কে মুসলিম এবং কে মুসলিম নয়, এ-প্রশ্নটিতে মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। এবং এই কারণেই কমিশন প্রায় সব নামজাদা আলেমদেরকে মুসলিমের সংজ্ঞা দিতে বলেন। কমিশন ভেবেছিলেন, বিভিন্ন দলের আলেমগণ যখন আহমদীদের কাফের ব'লে মনে করেন তখন মুসলিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই স্পষ্ট। কিন্তু এ-ব্যাপারে আলেমদের যা জবাব পাওয়া

গেছে তাকে কিছুতেই সন্তোষজনক বলা যেতে পারে না। যে কোনো লোক সহজেই কল্পনা করতে পারে যে, এমন একটি সহজ সরল ব্যাপারে আলেমদের ধারণা যদি এতখানি অস্পষ্ট হয়, তবে আরো জটিল ব্যাপারে তাঁদের মতভেদটা কী সাংঘাতিক হবে!

মুসলিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমরা যিনি যে-রকম বলেছেন নীচে তা উধৃত করা হলো:

জমিয়াতুল-উলামায়ে-পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহ্‌মদ কাদরী:

"প্র: মুসলমানের সংজ্ঞা কি?

উ: (১) খোদার একত্বে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

(২) রসূল (দঃ) এবং তাঁ'র পূর্ববর্তী সব নবীদেরকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।

(৩) রসূল (দঃ)কে শেষ নবী ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।

(৪) রসূল (দঃ)এর নিকট আল্লাহ্ কোরান নাজেল করেছেন ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।

(৫) রসূল (দঃ)এর আদেশাবলী অবশ্য পালনীয় ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।

(৬) কেয়ামতে বিশ্বাস করতে হবে।

প্র: যে নামাজ পড়ে না, সে কি মুসলিম?

উ: হাঁ, কিন্তু যে নামাজে বিশ্বাস করে না, সে মুসলিম নয়।"

পশ্চিম পাকিস্তানের জামিয়াতুল-উলামায়ে-ইসলামের সভাপতি মওলানা আহ্‌মদ আলী:

"প্র: মুসলিমের সংজ্ঞা কি?

উ: কোরান এবং রসূলের বাণীতে যে বিশ্বাস করে সে মুসলিম। এ দু'টি জিনিসে বিশ্বাস করলেই যে-কোনো লোককে মুসলিম বলতে হবে—সেজন্যে তার অতিরিক্ত কোনো কিছুতে বিশ্বাস করার বা অতিরিক্ত কোনো কিছু পালন করার প্রয়োজন নেই।"

জামাত-ই-ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী:

"প্র: মুসলিমের সংজ্ঞা কি?

উ: (১) তওহীদ (২) সকল নবী (৩) খোদার নাজেল করা সব কেতাব (৪) ফেরেশ্‌তা এবং (৫) শেষ বিচারের দিনে যে বিশ্বাস করে সে-ই মুসলিম।

প্র: যদি কোনো লোক কেবলমাত্র বলে যে, সে এই সব জিনিসে বিশ্বাস করে, তবেই কি সে নিজেকে মুসলিম বলতে পারে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে কি তাকে মুসলিম বলে গ্রহণ করা হবে?

উ: হাঁ।

প্র: যদি কোনো লোক বলে যে, সে এর সব জিনিসেই বিশ্বাস করে, তবে অন্য কেউ কি তার বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে?

উ: আমি ইতোপূর্বে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছি তাতে বিশ্বাস করা হচ্ছে মৌলিক এবং এর কোনোটায় কোনো প্রকার রদ-বদল করলেই সে ইসলামের বাইরে চলে যাবে।"

গাজী সিরাজুদ্দিন মুনির:

"প্র: মুসলিম সম্পর্কে আপনার সংজ্ঞা কি?

উ: আমার মতে যে ব্যক্তি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'—এই কলেমায় বিশ্বাস করে ব'লে প্রকাশ করে এবং রসূলের পদাংক অনুসরণ ক'রে জীবনযাপন করে, সে-ই মুসলিম।"

মুফতি মোহাম্মদ ইদরিস, জামিয়া আশ্‌রাফিয়া, নীলা গুম্বাদ, লাহোর:

"প্রঃ মুসলমানের সংজ্ঞা কি?

উঃ 'মুসলমান' শব্দটি ফারসী। ফারসী শব্দ 'মুসলমান'-এর সংগে 'মুমিন' শব্দের পার্থক্য আছে। মুমিন শব্দের পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মুমিনের বর্ণনা করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেগে যাবে। আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি আছে ব'লে যে ব্যক্তি প্রকাশ করে সে মুসলিম। খোদার একত্বে, নবীদের নবুয়াতে এবং শেষ বিচারের দিনে তাকে বিশ্বাস করতে হবে। যে লোক আজান বা কোরবাণীতে বিশ্বাস করে না, সে ইসলামের বাইরে। আমাদের নবীর কাছ থেকে বহু নির্দেশাবলী এসেছে। মুসলিম হতে হলে তাকে এর সব কিছুতে বিশ্বাস করতে হবে। এর সব কিছুর একটা পুরো ফিরিস্তি দেওয়া আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।"

হাফিজ কিফায়াত হোসেন, ইদারায়ে-হকুকই-তাহাফ্‌ফুজে-শিয়া:

"প্রঃ মুসলমান কে?

উঃ মুসলমান তাকে বলা হবে, যে (১) তওহিদ (২) নবুয়াত এবং (৩) কিয়ামতে বিশ্বাস করে। মুসলমান ব'লে স্বীকৃত হতে হলে এই তিনটি মৌলিক বিশ্বাস আছে ব'লে বলতে হবে। এই তিনটি মৌলিক মতবাদ সম্পর্কে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক জিনিস আছে, যাকে 'জরুরিয়াতে দীন' বলা হয়। মুসলমান হতে হলে এগুলিও তাকে পালন করতে হবে। এ-সব জিনিসের ফিরিস্তি দিতে গেলে এবং ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমার দু'দিন লেগে যাবে। তবে উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে: কোরানের প্রতি শ্রদ্ধা, ওয়াজুব-ই-নামাজ, ওয়াজুব-ই-রোজা, ওয়াজুব-ই-হজ-মাআ-শরিয়াত এবং আরও অসংখ্য জিনিস জরুরিয়াতে-দীনের অন্তর্ভুক্ত।"

জমিয়াতুল-উলামায়ে-পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী:

"প্রঃ আপনার মতে মুসলমান কে?

উঃ যে জরুরিয়াতে-দীন-এ বিশ্বাস করে, তাকে মুমিন বলা হয়, এবং প্রত্যেক মুমিনকে মুসলমান বলতে হবে।

প্র: এ-সব জরুরিয়াতে-দীনগুলি কি?

উ: ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে এবং রসূলের রাসালাতে যে বিশ্বাস করে, সে জরুরিয়াতে-দীন পালন করে।

প্র: পাঁচটি 'আরকান' ছাড়া অন্য (নৈতিক) কার্যকলাপের সংগে কোনো লোকের মুসলমান হওয়া বা ইসলামের বাইরে চলে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি?

উ: নিশ্চয়ই।

প্র: একটা লোক পাঁচটি স্তম্ভে এবং রসূলের রাসালাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু অন্যের জিনিস চুরি করে, আমানতের মাল হজম ক'রে ফেলে, প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি বদ্‌খেয়াল রাখে এবং সাংঘাতিক রকমের নিমকহারামী করে—তাকে কি তা হলে আপনি মুসলিম বলবেন?

উ: লোকটির যদি পূর্ব-বর্ণিত বিশ্বাস থাকে, তবে এ-সব সত্ত্বেও তাকে মুসলিম বলা হবে।"

মওলানা মোহাম্মদ আলী কান্দাহালভি, দারুস শাহাবিয়া, শিয়ালকোট:

"প্র: মুসলিমের সংজ্ঞা বলুন।

উ: যে ব্যক্তি রসূলের আদেশ মান্য ক'রে সব জরুরিয়াতে-দীন পালন করে সে-ই মুসলিম।

প্র: জরুরিয়াতে-দীনের সংজ্ঞা বলতে পারেন?

উ: জরুরিয়াতে-দীন সব মুসলমানেরই জানা আছে—তার ধর্মীয় জ্ঞান যতটুকুই থাক না কেন।

প্র: জরুরিয়াতে-দীনের সংখ্যা বলতে পারেন?

উ : এত অসংখ্য যে উল্লেখ করা যায় না। আমি নিজেই এগুলির সংখ্যা বলতে পারি না। তবে এর কয়েকটি হচ্ছে যেমন—নামাজ, রোজা, ইত্যাদি।

মওলানা আমিন আহ্সান ইসলাহী :

"প্র : মুসলমান কে ?

উ : দু'রকমের মুসলমান আছে—রাজনৈতিক (সিয়াসি) মুসলমান এবং খাঁটি (হকিকি) মুসলমান। রাজনৈতিক মুসলমান ব'লে গণ্য হতে হলে অবশ্যই :

(১) আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস করতে হবে।
(২) রসূলকে শেষ নবী ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।
(৩) সব কিছু ভালো ও মন্দ আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।
(৪) শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করতে হবে।
(৫) কোরানকে আল্লাহ্র নাজেল করা শেষ কেতাব ব'লে বিশ্বাস করতে হবে।
(৬) বাৎসরিক হজ্ব পালন করতে হবে।
(৭) জাকাত দিতে হবে।
(৮) মুসলমানদের মতো নামাজ পড়তে হবে।
(৯) ইসলামী মুয়াশারার সব নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে ; এবং
(১০) রোজা রাখতে হবে।

যদি কোনো লোক এই সকল শর্ত পূরণ করে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিকের সব অধিকার সে পেতে পারে। এর কোনো একটি শর্ত অপূর্ণ থাকলে সে লোক রাজনৈতিক মুসলমান হতে পারবে না। কোনো লোক যদি কেবল মাত্র বলে যে, সে এই দশটি ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তা হলেই তাকে মুসলমান বলতে হবে—এগুলি সে পালন করুক বা না করুক।

খাঁটি মুসলমান হতে হলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সব আদেশাবলীতে বিশ্বাস করতে হবে এবং নির্দেশানুসারে সেগুলি পালন করতে হবে।

প্র : আপনি কি কেবলমাত্র খাঁটি মুসলমানকেই 'মর্দে সালেহ্' বলবেন ?

উ : হাঁ।

প্র : আমরা কি আপনার বক্তব্য ঠিকমত বুঝতে পেরেছি—যদি বলি যে, রাজনৈতিক মুসলমানের বেলায় প্রয়োজন কেবল বিশ্বাসের, কিন্তু খাঁটী মুসলমানের বেলায় শুধু বিশ্বাস হলে চলবে না, কর্মও চাই ?

উ : না, আপনারা আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। রাজনৈতিক মুসলমানের জন্যেও কর্মের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বাসকে পালন না করে, তবে সে রাজনৈতিক মুসলমানের গণ্ডীর বাইরে চলে যাবে না।

প্র : রাজনৈতিক মুসলমান যদি আপনার বর্ণিত জরুরী ব্যাপারগুলিতে বিশ্বাস না করে, তা হলে আপনি কি তাকে 'বে-দীন' বলবেন ?

উ : না, আমি তাকে কেবল 'বে-আমল' বলবো।"

রাবওয়ার আন্জুমানে-আহমদিয়ার সভাপতি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন : যে-ব্যক্তি রসূলের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং কলেমা-তৈয়বে বিশ্বাস করে, সে-ই মুসলিম।

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

আলেমরা যে-সব বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তা' খেয়াল করলে আর মন্তব্য করার দরকার হয় না যে, এই মৌলিক ব্যাপারটি সম্পর্কে কোনো আলেমের মতের সংগেই অন্য আলমের মিল নেই। কমিশন বলছেন: "প্রত্যেক আলেমের মতো আমরাও যদি আমাদের নিজস্ব একটা সংজ্ঞা দিতে যাই এবং সে সংজ্ঞা যদি অন্য সব আলেমদের দে'য়া সংজ্ঞা থেকে আলাদা হয়, তবে বিনা মতভেদে আমরা ইসলাম-বহির্ভূত হয়ে যাই এবং যদি আমরা যে-কোনো একজন আলেমের সংজ্ঞা গ্রহণ করি, তবে তাঁর মতে আমরা মুসলিম থাকি, কিন্তু অন্য সবার মতে কাফের হয়ে যাই।

ধর্ম পরিবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। এ-বিষয়ে অলেমরা প্রায় একমত। এই মতবাদ হিসেবে, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান যদি বংশ-পরম্পরা-সূত্রে আহমদী না হ'য়ে নিজে ইচ্ছা ক'রে আহমদী হ'য়ে থাকেন তবে তাঁকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অনুরূপভাবে দেওবন্দী ও ওহাবীদেরও ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড হবে যদি মওলানা আবুল হাসানাত সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ কাদরী বা মির্জা রেজা আহমদ খান ব্রেলভীর মতো ফতওয়া দাতাগণ এ-ধরনের ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতে পান। অন্যদিকে পাকিস্তান গণ-পরিষদের তালিকামতে ইস্‌লামী বোর্ডের সদস্য মওলানা মোহাম্মদ শফি দেওবন্দী যদি এ-রকম রাষ্ট্রের প্রধান হন, তবে যাঁরা দেওবন্দীদের কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে তিনি ইসলাম-বহির্ভূত ব'লে ঘোষণা করবেন এবং মৃত্যুদণ্ড দেবেন যদি তাঁরা মুরতাদ ব'লে প্রমাণিত হন, অর্থাৎ যদি তাঁরা নিজেরা তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তন ক'রে থাকেন।

দেওবন্দীদের ফতোয়া অনুযায়ী শিয়াগণ কাফের; কেননা তারা বিশ্বাস করে হজরত আলী (রঃ) রসূলের নবুয়াতের অংশীদার ছিলেন। শিয়াদের মতে সব সুন্নীরা কাফের। আহ্‌লে-কোরান অর্থাৎ যারা হাদিসকে বিশ্বাসযোগ্য এবং অবশ্য পালনীয় ব'লে মনে করে না, তাদেরকে সবাই মিলে কাফের বলে। স্বাধীনভাবে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরাও সবাই কাফের।

এ-সবের মোট ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, আহ্‌লে হাদিস, ব্রেলভী—কেউই মুসলিম নয়; ইসলামী রাষ্ট্রে এর কোনো এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে পরিবর্তন করলেই তার শাস্তি অবশ্যই মৃত্যু—যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমন দলের হাতে থাকে যাঁরা অন্য দলকে কাফের ব'লে মনে করেন। এই মতবাদের পরিণাম কি, সেটা বুঝতে বেশী কল্পনা খাটানোর প্রয়োজন হয় না যদি স্মরণ রাখা যায় যে, মুসলিমের সংজ্ঞা সম্পর্কে কোনো আলেমই অন্য আলেমের সংগে একমত হতে পারেন নি। যদি প্রত্যেকটি আলেমের সংজ্ঞা কার্যকরী করা হয় তবে বিভিন্ন যুক্তিতে যে-কোনো লোককে ধর্ম-পরিবর্তনের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

এই রিপোর্টের গোড়ার দিকে মওলানা শাব্বির আহ্‌মদ উসমানীর লেখা 'আশ্-শাহাব' পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মওলানা পরে শেখ-উল-ইসলাম-ই-পাকিস্তান উপাধি লাভ করেন। এই পুস্তিকায় কোরান, সুন্না, ইজমা এবং কেয়াস থেকে মওলানা দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলামে ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। এই শাস্তির গূঢ়তর মর্ম আছে। এর ফলে মনে হয় যেন ইসলাম যুক্তিহীন ক্ষ্যাপাদের ধর্ম এবং এতে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ। কোরান বারবার যুক্তি এবং চিন্তা-শক্তির উপর জোর দিয়েছে, সহনশীলতা চর্চা করতে বলেছে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তির বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এই পুস্তিকায় প্রচারিত মতবাদ গ্রহণ করলে স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কেউ যদি কখনও ইচ্ছামত ধর্ম বাছাই করার উদ্দেশ্যে চিন্তা করে, তার শাস্তি মৃত্যু। এই যদি অবস্থা হয় তবে ইসলামকে চিন্তা-শক্তির পঙ্গুতার নিশান ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। পুস্তিকায় উল্লেখ

করা হয়েছে যে, আরব দেশের বিরাট এলাকা বারবার মুরতাদদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। এ-কথা যদি সত্য হয় তবে এই বুঝা যায় যে, আরবদেশে ইসলাম যখন গৌরবের উচ্চতম শিখরে, তখন সেই দেশে এমন বহু লোক ছিল যারা ইসলামের ভেতরে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করতো। হয়ত মনে এমনি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার জন্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজির পাঞ্জাব সরকারকে পুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করার পরামর্শ দেন।

অন্য ধর্মের প্রচার

ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তির সংগে জড়িত রয়েছে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের অধিকার। যে নীতির বলে ধর্ম পরিবর্তনকে অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয়, প্রকাশ্যে কুফর প্রচারের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে। মওলানা আবুল হাসানাত, গাজী সিরাজুদ্দিন মুনীর এবং মাষ্টার তাজুদ্দিন—এঁরা সবাই এ কথা স্বীকার করেছেন।

গাজী সিরাজুদ্দিন মুনিরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি জবাব দেন :

"প্রঃ আপনি যদি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান হতেন তবে আহমদীদের কি করতেন?

উঃ মানুষ হিসাবে আমি তাদের অধিকার স্বীকার করতাম, কিন্তু তাদের ধর্মপ্রচারের অধিকার কিছুতেই দিতাম না।"

ধর্ম পরিবর্তনের শাস্তি যদি মৃত্যু হয় এবং ইস্‌লামের প্রতি কোনো প্রকার আক্রমণ করলে যদি তাকে দেশদ্রোহিতা বলা হয় তবে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, প্রকাশ্যে কোনো অমুসলিম ধর্ম প্রচার করতে দেওয়া যেতে পারে না।

জিহাদ

আহমদীদের সংগে মুসলমানদের যে-সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে জিহাদ তার একটি। এই বিষয়টির সংগে আরো অনেক প্রশ্ন জড়িত; যেমন গাজী, শহীদ, তরবারীর যুদ্ধ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যুদ্ধ, দারুল ইস্‌লাম, দারুল হার্‌ব, হিজরত, গণিমা, খুম্‌স্‌ এবং ক্রীতদাস প্রথা। আধুনিক আন্তর্জাতিক সমস্যা ও আইনের সংগে এগুলির বিরোধ ও সমন্বয়ের প্রশ্নও রয়েছে।

ইস্‌লামী রাষ্ট্র হচ্ছে দারুল ইস্‌লাম, অর্থাৎ যেখানে ইস্‌লামী আইন-কানুনের শাসন চলে এবং যার শাসন-কর্তা হচ্ছেন মুসলিম। এর অধিবাসিগণ হচ্ছে মুসলমান; অমুসলমানও হতে পারে যদি তারা মুসলিম শাসনের কাছে নতি স্বীকার ক'রে থাকে। ইস্‌লামী রাষ্ট্র তাদের জান-মাল রক্ষা করবে, তবে তারা পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার পাবে না। তাদের অবশ্য কেতাবে বিশ্বাসী হতে হবে—মূর্তিপূজক হতে পারবে না। থিওরি অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রের সংগে অনুক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র যে-কোনো সময় দারুল-হারবে পরিণত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের কর্তব্য হবে সে দেশ ছেড়ে ইস্‌লামী রাষ্ট্রে চলে আসা। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে মওলানা আবুল আলা মওদুদীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন :

"প্রঃ ইস্‌লামী রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কি সর্বদাই দারুল-হারব?

উঃ না। কোনো চুক্তির অবর্তমানে প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রের সংগে ইস্‌লামী রাষ্ট্র যুদ্ধাবস্থার সম্ভাবনায় থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্র যখন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করবে তখনই অমুসলিম রাষ্ট্রকে দারুল-হারব বলা হবে।"

পাকিস্তান যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় এবং ভারতের সংগে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধে, তবে ভারতের চার কোটি মুসলমানকে পাকিস্তানে জায়গা দে'য়ার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, জমিয়াতুল উলামায়ে

পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী মনে করেন ভারতের মুসলমানদের এখনই হিজরাত করা উচিত। তাঁর প্রতি সওয়াল-জবাব হচ্ছে:

"প্র: আপনার পাকিস্তানে আগমন কি ধর্মীয় অর্থে হিজরাত?

উ: হাঁ।"

জিহাদ সম্পর্কে নানারকম ধারণা এবং নানা মতভেদ রয়েছে। জিহাদ সম্পর্কে মোটামুটি যে-সব প্রামাণ্য লেখা পেশ করা হয়েছে—মওলানা আবুল আলা মওদুদী এবং মওলানা শাব্বির আহমদ উস্‌মানীও কিছু লেখা পেশ করেছেন—তা থেকে এই বুঝা যায় যে, অস্ত্রের দ্বারা এবং দেশ জয় ক'রে ইস্‌লামী এলাকার আওতা বৃদ্ধি করতে হবে। 'আক্রমণ' এবং 'নরহত্যা'কে আজকাল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লে গণ্য করা হয়। এই অপরাধের জন্যে জার্মানী ও জাপানের যুদ্ধ-নেতাদের আন্তর্জাতিক আদালতের হুকুমে প্রাণ দিতে হয়। 'আক্রমণ' এবং 'নরহত্যা'র সংগে অস্ত্র ও বিজয়ের দ্বারা ইস্‌লাম প্রচারের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। নরহত্যা সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরী হতে যাচ্ছে; পাকিস্তান হয়তো এ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হবে। বস্তুতঃ কোরান শরীফের ২য় সুরার ১৯০ ও ১৯৩ আয়াত এবং ২২শ সুরার ৩৯ ও ৪০ আয়াত যদি একেবারে উড়িয়ে দে'য়া না হয় তা'হলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে যে সুমহান আদর্শের কথা রয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌রা এতদিনে ভাসাভাসা ভাবেই মাত্র তার হাদিস পেতে শুরু করেছেন।

যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের সংগে ইস্‌লামী আইনের বিরোধ হতে বাধ্য। এ সম্পর্কে মওলানা আবুল আলা মওদুদির মত হচ্ছে:

"প্র: ইসলামে কি যুদ্ধ-আইন ব'লে কোনো কিছু আছে?

উ: হাঁ।

প্র: যুদ্ধ সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সংগে এর কি কোনো মৌলিক তফাত আছে?

উ: মৌলিক তফাতের উপরই এ দু'টি প্রথার ভিত্তি।

প্র: জিহাদ-কালে যে-সব অমুসলিম যুদ্ধবন্দী নে'য়া হয় তাদের অধিকারাদি কি?

উ: এ সম্পর্কে ইস্‌লামী আইন হচ্ছে: যুদ্ধবন্দীরা যে-দেশের নাগরিক সে-দেশ যদি তা'দের মুক্তির মূল্য দেয় তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। দু'দেশের মধ্যে পরস্পর বন্দী বিনিময়েরও অনুমতি আছে। এ দু'টির কোনোটিই যদি সম্ভব না হয় তবে বন্দীদেরকে চিরতরে ক্রীতদাস ক'রে রাখা হবে। কোনো যুদ্ধবন্দী যদি নিজের রোজগার থেকে মুক্তির মূল্য দিতে চায় তবে সে অর্থ সংগ্রহের অনুমতি তাকে দে'য়া হবে।

প্র: আপনি কি মনে করেন যে, খাঁটি ইস্‌লামী সরকার ভিন্ন অন্য কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করলে তা জিহাদ হবে না?

উ: না। রাষ্ট্রের স্বার্থে মুসলমানদের জাতীয় সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাকেও জিহাদ বলা যেতে পারে।"

এ-সম্পর্কে মওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আহমদ কাদরীর মত হচ্ছে:

"প্র: ইস্‌লামে কি যুদ্ধ-আইন ব'লে কোনো কিছু আছে?

উ: হাঁ।

প্র: বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের সংগে এর কি কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে?

উ: হাঁ।

প্র: যুদ্ধ-বন্দীর অধিকারাদি কি?

উঃ সে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারে অথবা 'আমান' চাইতে পারে। 'আমান' চাইলে তাকে 'মুস্‌তা-মিন' বলে গণ্য করা হবে। যদি সে 'আমান' না চায় তবে তাকে ক্রীতদাস ক'রে রাখা হবে।"

জামায়াতে ইস্‌লামীর মিয়াঁ তোফায়েল মোহাম্মদের মতামতও অনুরূপ তিনি বলেন :

"প্রঃ ইস্‌লামী আইনের ভেতর কি যুদ্ধ-আইন ব'লে কিছু আছে?

উঃ হাঁ।

প্রঃ সেটা আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী হলে আপনি কোন্‌টি মানবেন?

উঃ ইস্‌লামী আইন।

প্রঃ সেক্ষেত্রে আপনার সৈন্যেরা যে-সব যুদ্ধবন্দী ধরবে তাদের কি মর্যাদা হবে?

উঃ আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না। বিষয়টি সম্পর্কে আমার পড়তে হবে।"

অবশ্য গণিমা (লুটের মাল) এবং খুম্‌স্‌ (এক পঞ্চমাংশ) যদি জিহাদের প্রয়োজনীয় আনুসংগিক ব'লে গণ্য হয় তবে আন্তর্জাতিক সমাজ তাকে লুটতরাজ ছাড়া অন্য কিছু মনে করবে না।

অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর প্রতিক্রিয়া

যে মতবাদের উপর ভিত্তি ক'রে পাকিস্তানে ইস্‌লামী রাষ্ট্র গড়তে চাওয়া হয়, অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর তার কিছুটা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আমির-ই-শরিয়াত সৈয়দ আতাউল্লাহ্‌ শাহ্‌ বোখারীকে প্রশ্ন করা হয় যে, কোনো মুসলমান অমুসলিম রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক হতে পারে কি না। তাঁর জবাব হচ্ছে :

"প্রঃ আপনার মতে কোনো মুসলমান কাফের সরকারের হুকুম মানতে বাধ্য কি?

উঃ অমুসলিম সরকারের অধীনে কোনো মুসলমানের পক্ষে বিশ্বস্ত নাগরিক হিসাবে বাস করা সম্ভব নয়।

প্রঃ ভারতের চার কোটি মুসলমানের পক্ষে কি তাদের রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসাবে বাস করা সম্ভব।

উঃ না।"

আদালতের সামনে যে মতবাদ জাহির করা হয়েছে তার সংগে এই জবাবের মিল আছে; কিন্তু কথা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের যদি ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে শাসনতন্ত্র গড়ার অধিকার থাকে তবে অমুসলিম রাষ্ট্রেরও সে অধিকার থাকা উচিত—হয়ত সে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। সুতরাং আদালত বিভিন্ন আলেমদের প্রশ্ন করেন যে, নাগরিকত্ব সম্পর্কে অমুসলিমদের বেলায় পাকিস্তানে যদি এই ভেদাভেদ প্রয়োগ করা হয় তবে অন্যান্য রাষ্ট্রে মুসলমানদের প্রতি অনুরূপ ভেদাভেদ প্রয়োগ করলে তাঁদের কি আপত্তি আছে। এই বিষয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো :

জমিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবুল হাসানাত সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ কাদরী :

"প্রঃ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের একটি হিন্দু ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ার অধিকার আছে, সেটা আপনি স্বীকার করেন কি?

উঃ হাঁ।

প্রঃ সে রাষ্ট্রে মনুর আইন অনুসারে মুসলমানদের প্রতি যদি শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করা হয় তা'হলে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?

উঃ না।"

তদন্ত আদালতের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

মওলানা আবুল আলা মওদুদী :

"প্র : আমরা যদি পাকিস্তানে এই ধরণের ইস্‌লামী শাসন প্রবর্তন করি তবে আপনি হিন্দুদেরকে ভারতে তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে শাসনতন্ত্র গঠন করার অধিকার দেবেন কি?

উ : নিশ্চয়ই। তারা যদি মুসলমানদের প্রতি মনুর আইন প্রয়োগ করে, শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে এবং নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তা হলেও আমি কোনো আপত্তি করবো না। প্রকৃত-পক্ষে ভারতে এই ধরণের অবস্থা এখনই বিদ্যমান।"

আমীর-ই-শরিয়াত সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারী :

"প্র : ভারতে কয় কোটি মুসলমান আছে?

উ : চার কোটি।

প্র : তাদের প্রতি যদি মনুর আইন প্রয়োগ করা হয়; যার ফলে তারা সকল নাগরিক অধিকার হারাবে এবং শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার পাবে, তা হলে আপনার আপত্তি আছে কি?

উ : আমি পাকিস্তানে আছি, সুতরাং তাদের উপদেশ দিতে পারি না।"

জামাতে ইস্‌লামীর মিয়াঁ তোফায়েল মোহাম্মদ :

"প্র : দুনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা কত?

উ : পঞ্চাশ কোটি।

প্র : দুনিয়ার মুসলমানদের সংখ্যা আপনার কথা অনুসারে যদি পঞ্চাশ কোটি হয়, আর পাকিস্তান, সউদী আরব, ইয়েমেন, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, ইরাণ, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্স্-জর্দান, তুরস্ক এবং ইরাকে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা বিশ কোটির বেশী না হয়, তা হলে আপনার মতবাদের ফলে দুনিয়ার বাকী ত্রিশ কোটি মুসলমানকে নেহায়েত মজুর শ্রেণীতে পরিণত করা হবে না কি?

উ : আমার মতবাদের ফলে তাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

প্র : এমন কি যদি ধর্মীয় কারণে তাদের প্রতি অসম ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণ নাগরিক অধিকারাদি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়?

উ : হাঁ, তবুও।"

ইনি এ-ও বলছেন যে, অমুস্‌লিম সরকার যদি মুসলমানদেরকে সরকারী চাকুরী দেয় তবে তাদের উচিত হবে সে চাকুরী গ্রহণ না করা।

গাজী সিরাজুদ্দিন মুনীর :

"প্র : আপনি কি পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র চান?

উ : নিশ্চয়ই।

প্র : প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি তাদের রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে, তা'হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে?

উ : ইচ্ছা হলে তারা তা করতে পারে।

প্র : আপনি কি স্বীকার করেন যে, ভারতের সব মুসলমানকে শূদ্র ব'লে ঘোষণা ক'রে নাগরিক অধিকারাদি থেকে বঞ্চিত করার অধিকার তাদের আছে?

উঃ এটা করার আগে তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব যাতে বিনষ্ট হয় তার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। ভারতের মোকাবিলায় আমাদের শক্তি অনেক বেশী। ভারতকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমরা দেখাতে পারবো।

প্রঃ ধর্ম প্রচার করা কি মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্যের অংগ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করা কি ভারতের মুসলমানদের কর্তব্যের অংগ?

উঃ তাদের সে অধিকার থাকা উচিত।

প্রঃ যদি ভারতীয় রাষ্ট্র ধর্মের উপর ভিত্তি ক'রে গড়া হয় এবং ধর্ম প্রচার করার অধিকার থেকে মুসলমানদের বঞ্চিত করা হয়, তা হলে কি হবে?

উঃ ভারত যদি এ রকমের কোনো আইন করে, তা হলে আমি ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে জয় ক'রে নেব, কেননা আমি বিস্তার আন্দোলনে বিশ্বাস করি।"

পাকিস্তানে ধর্মীয় কারণে অমুসলিমদের প্রতি অসম ব্যবহার করলে ভারত বা অন্য কোনো রাষ্ট্র যদি তার দাদ নেয় তবে এই হবে তার জবাব।

মাষ্টার তাজুদ্দীন আনসারী:

"প্রঃ পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে আপনি যে মতবাদ দাবী করছেন, ভারতের চার কোটি মুসলমানদের জন্যেও কি তাই চান?

উঃ সে মতবাদ চালাতে গেলে তারা এক মিনিটও ভারতে টিকতে পারবে না।

প্রঃ স্থান ও সময়ের পরিবর্তনে কি মুসলমানদের মতবাদও পরিবর্তিত হয়?

উঃ না।

প্রঃ তা হলে আপনি যে মতবাদ গ্রহণ করছেন, ভারতের মুসলমানেরা সে মতবাদ গ্রহণ করবে না কেন?

উঃ এ প্রশ্নের জবাব তাদেরই দে'য়া উচিত।"

আদালতের সামনে যে মতবাদ জাহির করা হয়েছে, ভারতের মুসলমানগণ যদি তা গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রের কোনো কাজেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের বেলায়ও এ-কথা প্রযোজ্য। মুসলমানদেরকে সব জায়গায়ই সন্দেহের চোখে দেখা হবে। সৈন্যবাহিনীতে তারা যোগ দিতে পারবে না, কেননা এই মতবাদ অনুযায়ী মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের ভেতর যুদ্ধ বাধলে তাদের কর্তব্য হবে মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করা, অন্যথায় চাকরী ছেড়ে দেওয়া। এই বিষয়ে দু'জন আলেমের মত নীচে দেওয়া হলো:

জমিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তানের সভাপতি মওলানা আবুল হাসানাত সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ কাদরী:

"প্রঃ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতের মুসলমানদের কর্তব্য কি হবে?

উঃ তাদের কর্তব্য খুবই স্পষ্ট; অর্থাৎ আমাদের পক্ষে সাহায্য করা এবং ভারতের পক্ষ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা।"

মওলানা আবুল মওদুদী:

"প্রঃ ভারতের সংগে পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগলে ভারতের মুসলমানদের কর্তব্য কি হবে?

উঃ তাদের কর্তব্য স্পষ্ট; অর্থাৎ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা অথবা পাকিস্তানের নিরাপত্তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো কিছু না করা।"

অন্যান্য ব্যাপার

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যাপার হচ্ছে, সব রকমের ভাস্কর্য, তাস খেলা, মানব-প্রতিকৃতি অঙ্কন, মানুষের আলোকচিত্র তোলা, গান-বাজনা, নাচ, পুরুষ-নারীর মিলিত অভিনয়, সিনেমা এবং থিয়েটার বন্ধ করতে হবে।

জমিয়াতুল উলামায়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মওলানা আবদুল হালিম কাসিমী বলেন ঃ

"প্র ঃ 'তাশবিহ' এবং 'তামসিল' সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উ ঃ কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করুন।

প্র ঃ 'লাহ-ও-লাব' সম্পর্কে আপনার কি মত?

উ ঃ এ প্রশ্ন সম্পর্কেও আমার উত্তর একই।

প্র ঃ মানুষের ছবি আঁকা সম্পর্কে আপনার কি মত?

উ ঃ এ ধরণের অংকন যদি প্রয়োজন হয় তবে আপত্তির কিছু নেই।

প্র ঃ ফটোগ্রাফি বা ছবি তোলা?

উ ঃ অংকন সম্পর্কে আমি যে জবাব দিয়েছি, এ প্রশ্নের জবাবও হচ্ছে তাই।

প্র ঃ ভাস্কর্য শিল্প সম্পর্কে কি মত?

উ ঃ আমাদের ধর্মে এটা নিষেধ।

প্র ঃ তাস খেলা কি আপনার মতে লাহ-ও-লা'বের অন্তর্ভুক্ত?

উ ঃ হাঁ, এটা লাহ-ও-লা'বের শামিল।

প্র ঃ গান-বাজনা এবং নাচ সম্পর্কে আপনার কি মত?

উ ঃ এ সবই আমাদের ধর্মের দ্বারা নিষিদ্ধ।

প্র ঃ নাটক এবং অভিনয়?

উ ঃ কি ধরণের অভিনয়ের কথা বলছেন, তার উপর নির্ভর করছে। এতে যদি অশ্লীলতা এবং নারী-পুরুষের মেলামেশা থাকে তবে তা ইসলামী আইনের বিরোধী।

প্র ঃ আপনার আদর্শ অনুযায়ী যদি রাষ্ট্র গড়া হয় তা হলে আপনি কি আইন ক'রে মানুষের ছবি আঁকা, মানুষের ছবি তোলা, ভাস্কর্য, তাস খেলা, গান-বাজনা, নাচ, অভিনয় ও সব সিনেমা এবং থিয়েটার বন্ধ ক'রে দেবেন?

উ ঃ বর্তমানে এই সব ব্যাপার যেভাবে চলছে তাতে আমার উত্তর হবে ঃ হাঁ।"

মওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনীর মতে মুসলমানদের মৃতদেহ কেটে ছাত্রদেরকে গঠন বুঝিয়ে অস্থিবিদ্যার অধ্যাপকেরা পাপের কাজ ক'রে থাকেন।

ধর্মীয় কারণে সৈন্যের বা পুলিশের লোকের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হুকুম অমান্য করার অধিকার থাকবে। এ সম্পর্কে মওলানা আবুল হাসানাতের মত হচ্ছে এই ঃ

"আমরা ধর্মবিরোধী মনে করি এমন কোনো কাজ যদি কোনো পুলিশের লোককে করতে বলা হয় তা হলে, আমি বিশ্বাস করি যে, সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য হবে কর্তৃপক্ষের হুকুম অমান্য করা। পুলিশের জায়গায় সৈন্য কথাটি ব্যবহার করলেও আমার উত্তর ঐ একই হবে।

প্র ঃ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ ধর্মবিরোধী কিনা তা বিচার করার অধিকার আপনি পুলিশ কর্মচারী বা সিপাইকে দেবেন কি?

উ ঃ অবশ্যই।

প্রঃ ধরুন, পাকিস্তান এবং অন্য একটি মুসলিম দেশের ভেতর যুদ্ধ বাধলে সিপাই মনে করলো যে, পাকিস্তান অন্যায়ের দিকে এবং অন্য পক্ষের সৈন্যকে হত্যা করলে ধর্মবিরোধী কাজ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি তার অফিসারের আদেশ অমান্য করে তা হলে আপনি কি সেটা সমর্থন করবেন?

উঃ এ-রকম পরিস্থিতির কখনও উদ্ভব হলে সিপাইয়ের উচিত হবে আলেমদের ফতোয়া নেওয়া।"

সাধারণ মানুষ মনে করছে পাকিস্তান একটি ইস্‌লামী রাষ্ট্র—যদিও তা' সে-রকম কিছুই না। এই বিশ্বাসকে ফেনিয়ে তুলেছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ইস্‌লাম ও ইস্‌লামী রাষ্ট্রের জন্যে চতুর্দিকের গলা-ফাটানো চিৎকার। ইস্‌লামী রাষ্ট্রের মরীচিকা যুগে যুগে মুসলমানদের হাতছানি দিয়েছে এবং এর মূলে রয়েছে অতীত গৌরবের স্মৃতি। উজ্জ্বল অতীতের দিকে তাকিয়ে আজকের মুসলমান ইস্‌লামের পুনর্গৌরবের কামনা করে। দিশেহারা অবস্থায় সে পথের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোন্‌দিকে এগোবে তার ধারণা নেই। জয় করার মতো উপায় বা সামর্থ্য ও যেমন নেই, তেমনি জয় করার মতো দেশও আর বাকী নেই। সে বুঝতে পারে না যে, প্রাথমিক যুগে ইসলামকে যে ধরণের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, আজকের শক্তি তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তার পূর্ব-পুরুষ যে জ্ঞানের সূত্রপাত করেছিল তার উপর ভিত্তি ক'রে মানুষ এমন জিনিস তৈরী করছে যা তার পক্ষে বুঝাও কঠিন। সুতরাং নিজেকে সে দেখতে পাচ্ছে নেহায়েত অসহায় অবস্থায়—সে ভাবছে, কেউ হয়ত এসে তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। কোনো কিছুই হবে না, কিন্তু তবু তার অপেক্ষার অন্ত নেই। প্রাণহীন জিনিস থেকে জীবনী শক্তিকে আলাদা ক'রে নেওয়ার মতো দৃষ্টিভংগির একটা বলিষ্ঠ পরিবর্তন না আসলে ইস্‌লাম-কে বিশ্ব-মত হিসেবে বাঁচিয়া রাখা যাবে না। এই পরিবর্তন না হলে, মুসলমানদেরকে তাদের অতীতমুখী ভাব থেকে উদ্ধার ক'রে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

বলিষ্ঠ এবং সুস্পষ্ট চিন্তাধারার এই অভাবের ফলেই পাকিস্তানে আজ এমন একটা কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে যা বারবার পাঞ্জাব-দাংগার মতো অবস্থার সূচনা করবে যদি আমাদের নেতারা তাঁদের লক্ষ্য এবং উপায় সুস্থির না করেন।

নেতাদের সাহায্য না পেলেও ইস্‌লাম বেঁচে থাকবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ্‌র আদেশই যদি কোনো লোককে মুসলমান রাখতে না পারে তবে তাদের হাতে গড়া আইনও পারবে না।

দাবীগুলির প্রতি খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতিক্রিয়া

আহমদীদের বিরুদ্ধে তিনটি দাবী নিয়ে আলেমদের সংগে খাজা নাজিমুদ্দীনের যেরূপ প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা হয়, তাতে মনে হয়, ধর্মীয় দিক দিয়ে দাবীগুলির যৌক্তিকতা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। খাজা নাজি-মুদ্দীন অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক। দাবীগুলি তিনি সোজাসুজি অগ্রাহ্য ক'রে দেন নি, তাতে মনে হয় এগুলির যৌক্তিকতার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর বেশ খানিকটা বিশ্বাস ছিল। সংগে সংগে এটাও তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, এই ধরণের ধর্মীয় ব্যাপার নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাষ্টের ঘাড়ে একবার পড়লে তাকে আরো অনেক অদ্ভুত দাবীর সম্মুখীন হতে হবে। এই দাবীগুলি গ্রহণ করলে ইস্‌লামী দুনিয়া এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার উপর যে প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কেও তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা করেছিলেন।

যে মূল বিষয়টি দাবীগুলিতে অন্তর্নিহিত ছিল তা হচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক-দের অধিকারের মধ্যে মৌলিক তফাৎ রয়েছে এবং কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি মুসলিম কি না সেটা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের একটি সাধারণ কর্তব্য। (চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান এবং আহমদী সম্প্রদায়ের আরো অনেকে—যাঁরা

দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত, তাঁদের সরানোর দাবী আরো জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খানকে প্রায় সবাই জানে এবং আন্তর্জাতিক জগতে তাঁর যথেষ্ট সম্মান। তাঁকে সরালে চারদিকে প্রচার হয়ে যেত এবং ফলে আন্তর্জাতিক জগতে যে ধরণের মন্তব্য হতো তার জবাব দেওয়া মুশ্‌কিল হয়ে পড়তো। শাসনতন্ত্র আইন অনুসারে ধর্মবিশ্বাসের জন্যে চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান বা অন্য কোনো আহমদীকেই তাঁর চাকুরীর পদ থেকে সরানো যায় না। ১৯৫০ সালের ৬ই অক্টোবর গণপরিষদ পাকিস্তানের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারাদি সম্পর্কীয় একটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, ধর্ম, বংশ, গোত্র, নারী-পুরুষ এবং জন্মের স্থান নির্বিশেষে পাকিস্তানের যে কোনো নাগরিকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালন ও প্রচার করার অধিকার সম্পর্কেও গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। জাতিপুঞ্জের দ্বারা নিযুক্ত একটি কমিশন মানবাধিকার সম্পর্কে যে খসড়া চুক্তি রচনা করেছে, তার ১৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে। ধর্ম পরিবর্তন করার এবং সে ধর্ম প্রকাশ্যে প্রচার ও পালন করার স্বাধীনতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব দাবীগুলি গ্রহণ করলে আন্তর্জাতিক জগতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হতো এবং পাকিস্তানে কি কাণ্ড-কারখানা হচ্ছে সে সম্পর্কে সবারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো। পাকিস্তানের নাকে কালি ছিটানোর সুযোগ ভারত কখনই ছেড়ে দেয় না, সুতরাং এই সুযোগও সে কিছুতেই ছাড়তো না। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তার নিজেরও আছে। সুতরাং সে নিশ্চয়ই অভিযোগ করতো যে, ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের নিষ্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সম্পর্কীয় চুক্তি পাকিস্তান ভংগ করেছে। এই চুক্তিতে অংগীকার করা হয় যে, উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ন্যায় সব রাষ্ট্রীয় কার্যে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। আহমদী ধর্ম বা আহমদী সম্প্রদায় সম্পর্কে ভারতের কোনো আগ্রহ ছিল না, কিন্তু দাবীগুলি গ্রহণ করলে কি ফলাফল হবে সেটা সে অবশ্যই উপলব্ধি করেছিল। আহমদীরা যদি সংখ্যালঘু হওয়ার দরুন রাষ্ট্রীয় কার্যে শরীক হতে না পারে তবে হিন্দুরাও নিশ্চয়ই পারবে না।

এই সব জটিল ব্যাপারগুলি খাজা নাজিমুদ্দীনের মনে নিশ্চয়ই জেগেছিল এবং তাঁর নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাসের সংগে এই দাবীগুলি গ্রহণ করার ফলাফলের একটা অস্বস্তিকর সংঘর্ষও তিনি বোধ করেছিলেন। সুতরাং তিনি আলেমদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছিলেন এই আশা নিয়ে যে, তাঁরা দাবীগুলি শেষপর্যন্ত পরিত্যাগ করবেন অথবা কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা মানুষের বুদ্ধি সমস্যাটির একটা সমাধান বের ক'রে দেবে। তিনি ভাবতে পারেননি যে, এই ধর্মীয় ব্যাপারটি নিয়ে যে-সব আলেমরা তাঁর সংগে এবং তাঁর সহকর্মীদের সংগে এত লম্বা আলাপ-আলোচনা চালালেন তাঁরা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে হুমকি স্বরূপ দেশে একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রে বসবেন।

শেষপর্যন্ত খাজা নাজিমুদ্দীন দাবীগুলি প্রত্যাখান করলেন এবং তাঁর সপক্ষে যুক্তি দেখালেন। সংগে সংগে তিনি আলেমদেরকে গ্রেফতার করার হুকুম দিলেন। এইসব গ্রেফতারের ফলে বিক্ষোভ, মিছিল, জনসভা এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো। এর পর লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, খুনখারাবি শুরু হলো, যার ফলে পুলিশকে বহু গোলাগুলী ছুড়তে হলো। এতে অবস্থার উন্নতি না হয়ে বরং অবনতি হতে লাগলো। পরিস্থিতি যখন একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেল তখন সৈন্যবাহিনী কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করলো।

———

পঞ্চম অধ্যায়

হাঙ্গামার দায়িত্ব

দাংগা-হাংগামার জন্য প্রধানতঃ দায়ী করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলন এবং লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্ব মুসলিম দলীয় সম্মেলন এবং এই উভয় সম্মেলনে যোগদানকারী বহু সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব পাশ করা হয় ১৯৫৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনের এক সভায়। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ ২২শে জানুয়ারী তারিখে খাজা নাজিমুদ্দীনকে চরমপত্র দেয় যে, হয় তিনি দাবীগুলি গ্রহণ করবেন, নতুবা পদত্যাগ করবেন।

চরমপত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি বিদ্রোহের নোটীশ। চরমপত্রের জবাব সন্তোষজনক না হলেই মজলিস-ই-আমল বা কর্ম-পরিষদ এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করবেন ও পরিচালনা করবেন। মজলিসের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, তাদের যা করার উদ্দেশ্য ছিল সেটা প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা নয় এবং তাতে শান্তি ভংগের কোনো আশংকা ছিল না। আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার না করলে নাকি গোলযোগের সূত্রপাতই হতো না। তাদের মতে নেতাদের গ্রেফতার ক'রে গোলযোগের সূচনা করায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারই দায়ী। এই যুক্তি একেবারেই অচল। প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার হুমকি, সরকারের বিরুদ্ধেই হুমকি। কোনো সরকারই এমন হুমকিতে সন্ত্রস্ত না হয়ে পারে না। খাজা নাজিমুদ্দীন আলেমদের নিরস্ত করানোর জন্যে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। দৃঢ়সংকল্প এবং কড়া সরকার হলে বহু আগেই এই সব আলেমদের গ্রেফতার করতেন এবং তাতে অন্যায় কিছু হতো না।

যদি কাউকে গ্রেফতার করা না হতো, তা হলেও যে আইন ও শৃংখলা ভংগ হতো এ-কথা শুধু তাঁরাই অস্বীকার করবেন যাঁরা আন্দোলনের সংগে জড়িত ছিলেন। আন্দোলনকারিগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ-ধরণের ফলাফল ঘটবে। চরমপত্র দেওয়ার আগে থেকেই তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বুলেট, রক্ত, রসূলের জন্যে জীবনদান, কাফনের কাপড়, আগুন ইত্যাদি সম্পর্কে ইংগিত ক'রে আসছিলেন।

দলিলপত্র থেকে দেখা যায়, খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রতি যখন চরমপত্র পেশ করা হলো, তখন কর্মপরিষদের লোকেরা জানতেন যে, এটা অগ্রাহ্য হ'লে যে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অবলম্বন করা হবে তাতে রক্তক্ষয় এবং খুব বড় রকমের একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। ঘটনা ঠিক সেই দিকেই মোড় নিলো। এতেই বুঝা যায়, দাংগার জন্যে মজলিস-ই-আমলের লোকেরাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। মজলিস-ই-আমলের লোকেরা যেহেতু কতকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, সুতরাং যে-সব দল বা ব্যক্তি করাচী সম্মেলনে যোগদান ক'রে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার প্রস্তাবটি পাশ করেন তাঁরা সবাই দাঙ্গা এবং তার ফলাফলের জন্যে দায়ী। লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্ব মুসলিম দলীয় সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও দায়ী, কেননা তাঁরাও প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উজীরে আজমের প্রতি চরমপত্রের হুমকি সমর্থন করেন এবং প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা কার্যকরী করার সব উপায়ের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া, তালিমাতে ইস্‌লামী বোর্ডের সদস্যগণ, জামাত-ই-ইস্‌লামী দল, আহরার দল, আহমদী দল, মুসলিম লীগ এবং পাঞ্জাবের কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র—সবাই দাংগা-হাংগামার জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী।

—শেষ—